অন্যদিন

হুমায়ূন আহমেদ

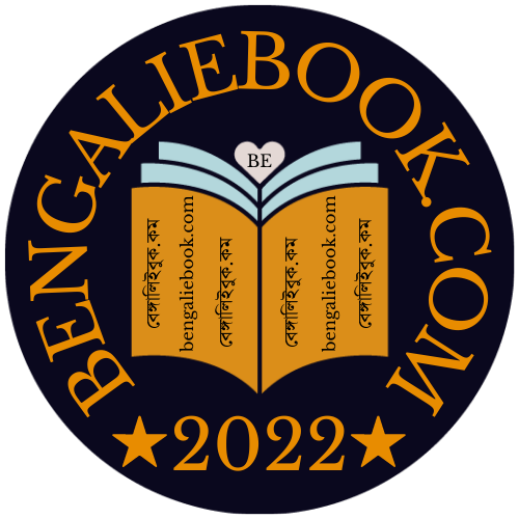

সূচিপত্র

১. পান্থনিবাস বোর্ডিং হাউস 2

২. সফিক আমাকে নিয়ে গেল রশীদ মিয়ার কাছে 13

৩. বাড়ি থেকে চিঠি এসেছে 26

৪. শীতের শুরুতে বাবা এসে হাজির 37

৫. একশ টাকা মনি অর্ডার 51

৬. জ্যোতির্ষিণব ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছেন 58

৭. আজকাল বড় অস্থির লাগে 69

৮. এত বড় বাড়ি খাঁ খাঁ করছে 77

১. পান্থনিবাস বোর্ডিং হাউস

পান্থনিবাস বোর্ডিং হাউস
১১-বি কাঁঠাল বাগান লেন (দোতালা)
ঢাকা-৯

চিঠি লিখলে এই ঠিকানায় চিঠি আসে। খুঁজে বের করতে গেলেই মুশকিল। সফিক লিখেছিল অবশ্যি, তোর কষ্ট হবে খুঁজে পেতে। লোকজনদের জিজ্ঞেস কবতে পারিস কিন্তু লাভ হবে বলে মনে হয় না। একটা ম্যাপ একে দিলে ভাল হত। তা দিলাম না, দুর্লভ জিনিস পেতে কষ্ট করতেই হয়।

এই সেই দুর্লভ জিনিস? দু'জন মানুষ পাশাপাশি চলতে পারে না। এরকম একটা গলির পাশে ঘুপসি ধরনের দোতলা বাড়ি। কত দিনের পুরনো বাড়ি সেটি কে জানে। চিতি পরে সমস্ত বাড়ি কালচে সবুজ বর্ণ ধারণ করেছে। দোতলায় একটি ভাঙা জানালায় ছেড়া চট ঝুলছে। বাড়িটির ডান পাশের দেয়ালের একটি অংশ সম্পূর্ণ ধসে গিয়েছে। সামনের নর্দমায় একটি মরা বেড়াল; দূষিত গন্ধ আসছে সেখান থেকে। মন ভেঙে গেল আমার। সুটকেস হাতে এদকি-ওদিক তাকাচ্ছি— দোতলায় যাবার পথ খুঁজছি, সিঁড়ি-ফিড়ি কিছুই দেখছি না। নিচ তলা তালাবন্ধ। নোটিশ ঝুলছে—

'এই দোকান ভাড়া দেওয়া হবে।'

দোতলার জানালার চটের পর্দার ফাক দিয়ে কে যেন দেখছিল আমাকে। তার দিকে চোখ পরতেই সে বলল, জ্যোতিষী খুঁজছেন? হাত দেখবেন? উপরে যান, বাড়ির পেছন দিকে সিঁড়ি।

পান্থনিবাস বোর্ডিং হাউসের লোকজন আমার চেনা। সফিক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লিখেছে আমাকে। সিঁড়ি দিয়ে উঠবার মুখে যার সঙ্গে দেখা হল তিনি যে নিশানাথ জ্যোতিষণিব তা সফিকের চিঠি ছাড়াও বলে দিতে পারতাম। প্রায় ছফুটের মত লম্বা ঝাকড়া ঘন চুলের একজন মানুষ কপালে প্রকাণ্ড এক সিঁদুরের ফোঁটা, মুখ ভর্তি দাড়ি। গায়ে গেরুয়া রঙের একটি চাদর; পরনে খাটো করে পর একটি ধবধবে সাদা সিল্কের লুঙ্গি! পায়ে রুপোর বোলের খরম। প্রথম দশনেই হকচাকিয়ে যেতে হয়। জ্যোতির্ষিণব সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলেন, হস্ত গণনা করাতে এসেছেন? পরীক্ষণেই গম্ভীর হয়ে বললেন, উঁহু, সুটকেস হাতে কেউ জ্যোতিষীর কাছে আসে না। লক্ষণ বিচারে ভুল হয়েছে। তুমি সফিকের কাছে এসেছ?

জি।

সফিক সারা সকাল অপেক্ষা করেছিল। তোমার না ভোরবেলা আসার কথা?

ট্রেন ফেল করলাম। ঢাকা মেইলে আসা লাগল।

জ্যোতির্ষাণর মহা গম্ভীর হয়ে বললেন,

আমি জানতাম। সফিককে বললাম। আশাভঙ্গ হওয়ার কারণ ঘটবে। সে সারা সকাল রাস্তার মোড়ে তোমার জন্য দাঁড়িয়েছিল। আশাভঙ্গ তো হলই ঠিক কিনা তুমি বল?

হ্যাঁ তা ঠিক।

ঠিক তো হবেই। তিন পুরুষ ধরে গুহ্য বিদ্যার চাচা আমাদের হুঁ হুঁ।

জ্যোতির্ষিণব আমাকে নিয়ে গেলেন তার ঘরে। তার ঘরের বর্ণনা সফিকের চিঠিতে পড়েছি। বাড়িয়ে লিখেনি কিছুই–ঘরে ঢুকলে যে কোন সুস্থ লোকের মাথা গুলিয়ে যাবে। তিনি জানালা বন্ধ করে ঘরটা সব সময় অন্ধকার করে রাখেন। অন্ধকার ঘরে একটি ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলে। ধূপদানী আছে, কেউ হাত দেখাতে আসছে টের পেলেই ধূপদানীতে এক গাদা ধূপ ফেলে নিমিষের মধ্যে গা ছমছমানো আবহাওয়া তৈরি করে ফেলেন। কিন্তু এতসব করেও তাঁর পসার নেই মোটেও।

জ্যোতির্ষিণব আমাকে চৌকিতে বসিয়ে ধূপদানীতে ধূপ ঢেলে দিলেন। নিঃশ্বাস বন্ধ হবার জোগাড়। থমথমে গলায় বললেন, উদ্দেশ্য সফল হবে তোমার। বি.এ. পাস করবে। ঠিকমত। কপালে রাজানুগ্রহের যোগ আছে। গ্রহ শান্তির একটা কবচ নিও আমার কাছ থেকে। সফিকের বন্ধু তুমি। নামমাত্র মূল্যে পাবে। আমি বললাম, কোথায়ও একটু গোসল করা যাবে? আশপাশে চায়ের দোকান আছে? বড় চা খেতে ইচ্ছা হচ্ছে।

জ্যোতির্ষিণব আঁৎকে উঠলেন। যেন এমন অদ্ভুত কথা কখনো শুনেন নি। রাগী গলায় বললেন, স্বাস্থ্য বিধির কিছুই দেখি জান না। গায়ের ঘাম না। মরতেই গোসল চা। ঠাণ্ডা হয়ে বস দেখি।

তিনি একটি টেবিল ফ্যান চালু করলেন। ফ্যানটি নতুন। ভয়ানক গভীর স্বরে বললেন, আমার এক ভক্ত দিয়েছে। এই সব বিলাস সামগ্রী দুই চক্ষে দেখতে পারি না। তান্ত্রিক মানুষ আমরা –এসব কী আমাদের লাগে? শীত গ্রীষ্ম সব আমাদের কাছে সমান।

ঘণ্টা দুয়েক অপেক্ষা করবার পর জ্যোতির্ষিণব আমাকে গোসলখানা দেখিয়ে দিলেন।

খুব সাবধানে গোসল সারবে রঞ্জু। দারুণ পিছল মেঝে। মেসের অন্য বোর্ডাররা কেউ নেই। যতক্ষণ ইচ্ছা থাক গোসলখানায়। চা আমি বানিয়ে রাখব এসেই গরম পাবে। কয় চামচ চিনি খাও চায়ে?

গায়ে পানি ঢালতেই শরীর জুড়িয়ে গেল। বরফের মত ঠাণ্ডা পানি। পথের ক্লান্তি, নতুন জায়গায় আসার উদ্বেগ সব মুছে গিয়ে ভাল লাগতে শুরু করল। হঠাৎ করেই মনে হল নীলগঞ্জের পুকুরে যেন ভরদুপুরে সাতার কাটছি। আমি অনেকবার লক্ষ্য করেছি। সুখী হওয়ার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে মানুষের। অতি সামান্য জিনিসও মানুষকে অভিভূত করে ফেলতে পারে।

আমার বাবার কথাই ধরা যাক। তাঁর মত সুখী লোক এ পৃথিবীতে খুব বেশি নেই বলেই আমার ধারণা! অথচ গত ছয় বছর ধরে তার কোন চাকরি-বাকরি নেই। তিনি ভোর বেলা উঠেই স্টেশনে যান। সেখানকার চায়ের স্টলটি নাকি ফ্যাস ক্লাস চা বানায়। খালি পেটে ঐ চা পর পর দুকাপ খাবার পর তিনি স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে গল্প-গুজব করেন। কি গল্প করেন তিনিই জানেন। নটার দিকে স্বরূলের ভাত রান্না হয় বাড়িতে। সে সময় তিনি বাড়ি ফিরে আসেন। আনজু এবং পারুলের সঙ্গে অতি দ্রুত ভাত খেয়ে নেন। সময় তার হাতে

খুব অল্প কারণ সাড়ে দশটার দিকে পোস্টাপিসে খবরের কাগজ আসে। কাগজটি পড়া তার কাছে ভাত খাওয়ার মতই জরুরি। সন্ধ্যাবেলা তিনি হারু গায়েনের ঘরে বেহালা বাজানো শিখেন। বর্তমানে এই দিকেই তার সমস্ত মন প্রাণ নিবেদিত। মহাসুখী লোক তিনি। মা যদি বলেন, পারুলের তো নাম কাটা গেছে স্কুলে। তিন মাসের বেতন বাকি।

বাবা চোখে-মুখে দারুণ দুঃশ্চিন্তার ছাপ ফুটিয়ে বলেন, বড়ই মুসিবত দেখছি। গভীর সমুদ্র। হুঁ যত মুশকিল তত আহসান। হাদিস কোরানের কথা। চিন্তার কিছু দেখি না। সমস্যার সমাধানও বের করেন সঙ্গে সঙ্গে, দরকার নাই স্কুলে পড়ার। পারুল মা, প্রাইভেটে মেট্রিক দিবে তুমি। আমি পড়াব তোমাকে। বইগুলি সব নিয়ে আয় তো মা এবং তিন নম্বরি একটা খাতা আন, রুটিনটা লেখি আগে।

মা ছাড়া আমরা কেউ বিরক্ত হই না বাবার ওপর। আমরা ছোটবেলা থেকেই জানি বাবা এক ভিন্ন জগতের বাসিন্দা। এই জগতের দুঃখ কষ্টের সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই।

আমাকে ট্রেনে তুলে দিতে বাবা স্টেশনে এসেছিলেন। ট্রেন ছাড়বার আগে আগে আমাকে বললেন,

রঞ্জু, একটু এদিকে শুনে যা তো।

পারুল আর আনজুর কাছে থেকে অনেকটা দূরে নিয়ে গেলেন আমাকে। গলার স্বর যথাসম্ভব নিচু করে বললেন, একটা ভাল বেহালার দাম কত, খোঁজ নিবি তো। ভুলিস না যেন।

খোঁজ নিব। ভুলব না।

আমার নিজের জন্যে না। বুড় বয়সে কী আর গান বাজনা হয়? তোর মাও পছন্দ করে না। অন্য লোকের জন্য।

আমি খোঁজ নিব।

ট্রেন ছাড়ার সময়ও এক কাণ্ড করলেন। ট্রেনের সঙ্গে দৌড়াতে শুরু করলেন। ট্রেনের গতি যত বাড়ে তার গতিও বাড়ে। ট্রেনের লোকজন গলা বাড়িয়ে মজা দেখতে লাগল।

গোসল সেরে দোতলায় উঠে এসে দেখি জ্যোতির্ষিণবের ঘর জমজমাট। দুতিন জন লোক বসে আছে পাংশু মুখে। জ্যোতির্ষিণব একজনের হাতের তালুর দিকে অখণ্ড মনযোগে তাকিয়ে আছেন। আমার দিকে না তাকিয়ে বললেন, পর্দা ঠেলে ভেতরে চলে যাও। চা পিরিচে ঢাকা।

আগে লক্ষ্য করিনি যে পায়রায় খুপড়ির মত ঘরও পর্দা দিয়ে দুভাগ করা। ভেতরে ঢুকে দেখি দড়ির খাটিয়ার উপর ধবধবে সাদা চাদরে চমৎকার বিছানা করা। বিছানার লাগোয়া একহাত বাই একহাত সাইজের টেবিল একটি। তার উপরও ধবধবে সাদা ঢাকনি। খাটিয়াটার মাথার পাশে বেতের শেলফ। শেলফের উপর চমৎকার একটি কাচের ফুলদানীতে ফুল। আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। জ্যোতিষণিব দেখি দারুণ সৌখিন লোক।

শুধু চা নয়। পিরিচে খাবার ঢাকা আছে। একটি লাড়ু এবং একটি সিঙ্গারা। আমি চ খেতে খেতে শুনলাম জ্যোতির্ষিণব গম্ভীর গলায় বলছেন, গ্রহ শান্তি কবচ নিতে পারেন আমার কাছ থেকে। রত্নও ধারণ করতে পারেন। তবে রত্ন অনেক দামী। তাছাড়া আসল জিনিস মিলবে না, চারদিকে জুয়াচুরি।

গ্রহ শান্তিতে কত খরচ পড়বে?

বিশ টাকা নেই। আমি, তবে আপনার জন্যে দশ।

দশ যে বড় বেশি হয়ে যায় সাধুজী।

জ্যোতির্ষাণব হাসেন।

পঞ্চ ধাতুর কবজের দামই মশাই পাঁচ টাকা। তাম্র স্বর্ণ রৌপ্য পারা ও দস্তা। তঞ্চকতা পাবেন না। আমার কাছে। একবার ধারণ করে দেখুন টাকাটা জলে যায় কিনা। টাকাই তো জীবনের সব নয়। হুঁ হুঁ।

বসে থাকতে থাকতে ঝিমুনি ধরে যায় আমার। সন্ধ্যা মিলিয়ে গেছে, ঘর অন্ধকার। সুইচ আছে একটি। আলো জ্বালাতে ঠিক সাহস হয় না। সাধুজী পাশের ঘরে প্রদীপ জেলে বসে আছেন। কে জানে ইলেকট্রিসিটির আলোতে তার হয়ত অসুবিধা হবে। সফিক কত রাতে ফিরবে কে জানে? শুয়ে পড়লাম সাধুজীর বিছানাতেই।

শুয়ে শুয়ে কত কি মনে হয়। বাবা যেন ম্যাকমিলান কোম্পানির তার সেই পুরানো চাকরিটা আবার ফিরে পেয়েছেন। গভীর রাত্রে বাড়ি ফিরেছেন প্রকাণ্ড একটা মাছ হাতে নিয়ে। পারুলের বিছানার পাশে ঝুকে ডাকছেন,

ওরে পারুল, ওরে টুনটুনি, ওরে কুট কুট, ওরে ভুটি ভুটি।

মা কপট রাগের ভঙ্গি করে বলছেন, কি যে পাগলামী তোমার। এই দুপুর রাতে মাছ কুটিতে বসব নাকি?

বাবার মুখ ভর্তি হাসি।

একশ বার বসবে। হাজার বার বসবে।

পারুল ঘুম ভেঙে উঠে বসেছে। বার বার বলছে,

বইটা এনেছ বাবা? দেশ বিদেশের রূপকথা নাম লিখে চিঠি দিয়েছিলাম যে তোমাকে?

উঁহু, বড্ড ভুল হয়ে গেছে রে। একটুও মনে নেই। সামনের শনিবার ঠিক দেখিস...

পারুলের নিচের ঠোট বেঁকে যেতে শুরু করতেই বাবা ম্যাজিসিয়ানের ভঙ্গিতে বলে উঠেছেন,

টেবিলের উপর রূপকথার বইটা আবার কে আনল?

ঝিমুনি ধরলেও ঘুম আসে না আমার। বিছানায় এপাশ ওপাশ করি। ধূপের গন্ধে দম আটকে আসে একেকবার। কী যে কাণ্ড সাধুজীর। সফিক চিঠিতে লিখেছিল, দুনিয়াতে মন্দ মানুষ এত বেশি বলেই ভাল মানুষদের জন্য আঁমাদের এত মন কাঁদে। আমাদের নিশানাথ এমন একজন ভাল মানুষ। মানুষকে দেওয়াই যার জীবিকা— সে এমন ভাল মানুষ হয় কি করে কে জানে?

রাত নটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও সফিকের দেখা পাওয়া গেল না। নিশানাথ বাবু আমাকে বসিয়ে রেখে নিচে খেতে গেলেন। খাওয়ার পর আমাকে হোটেল থেকে খাইয়ে আনবেন।

হোটেলটি বেশ খানিকটা দূরে। নানান প্রসঙ্গে গল্প করতে করতে সাধুজী হাঁটছেন। অনেকেই দেখি তাঁকে চেনে। একটি পানওয়ালা দাঁত বের করে বললো, সাধুজীর শইলটা বালা নাকি?

তিনি থেমে বেশ খানিকক্ষণ কথাবার্তা বললেন পানওয়ালার সঙ্গে। তার গল্প বলার ঢং চমৎকার। মুগ্ধ হয়ে শুনতে হয়। সফিক প্রসঙ্গে বলেন, সফিক ছেলেটা ভাল তবে বড় ফাজিল। ফাজলামী করে আমার সঙ্গে। আমি নাকি লোক ঠকিয়ে খাই। ছিঃ ছিঃ কি কুৎসিত চিন্তা। আমরা হচ্ছি তিন পুরুষের জ্যোতিষী। আমার ঠাকুরদা। তারানাথ চক্রবর্তী ছিলেন সাক্ষাৎ বিভূতি। মানুষের হাত দেখে জন্মবার বলতে পারতেন। আজকালকার ছেলে।পুলেরা এসবের কী জানবে?

কথা বলতে বলতে সাধুজীর মুখের ভাব বদলায়। রশীদ মিয়ার কথা বলতে বলতে তিনি চোখ-মুখ কুঁচকে এমন ভাবে তাকান যেন রশীদ মিয়া ছুরি হাতে মারতে আসছে। রশীদ

মিয়া, বুঝলে নাকি রঞ্জু? নরকের কীট। দেখা হলেই বলবে–বিজনেস কেমন চলছে আপনার?

আমি চুপ করে থাকি। সাধুজী রাগী গলায় বললেন, হাত দেখা বিজনেস হলে আজ আমার গাড়ি বাড়ি থাকত। সুসং দুর্গাপুরের জমিদার ভূপতি সিংহ আমার ঠাকুরদাকে আশি বিঘা লাখেরাজ সম্পত্তি দিতে চাইলেন। ঠাকুরদা বললেন, ক্ষমা করবেন, দরিদ্র ব্রাহ্মণ। সম্পত্তির মোহে পড়তে চাই না। রশীদ মিয়া কী বুঝবে আমাদের ধারা?

সফিক ফিরতেই তুমুল ঝগড়া শুরু হয়ে গেল জ্যোতির্ষিণবের সঙ্গে। সফিক গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, আমার ঘরের চাবি দিয়ে গেলাম আপনার কাছে। বললাম, রঞ্জু আসামাত্র আমার ঘর খুলে দেবেন তা না নিজের অন্ধ কূপের ধোয়ার মধ্যে নিয়ে...

তাতে তোমার বন্ধুর কোনো ক্ষতি বৃদ্ধি হয়েছে?

না হোক মেসে রঞ্জুর জন্যে রান্না করতে বলে গেছি। টাকা খরচ করে তাকে হোটেল থেকে খাইয়ে এনেছেন। টাকা সস্তা হয়েছে?

টাকার মূল্য আমার কাছে কোনো কালেই নেই সফিক।

বড় বড় কথা বলবেন না। লম্বা লম্বা বাত শুনতে ভাল লাগে না। সামান্য ব্যাপার নিয়ে সফিক এত হৈচৈ করছে কেন বুঝতে পারলাম না। আমার লজ্জার সীমা রইল না।

সফিকের ঘরে দুটি চৌকি পাতা। আবর্জনার স্তুপ চারদিকে। দীর্ঘ দিন সম্ভবত ঝাঁট দেয়া হয় না। একপাশে একটি থালায় অভুক্ত ভাত পড়ে আছে। সফিক আমাকে বলল, লম্বা হয়ে শুয়ে পড়। সকালে কথা বলব।

তুই কোথায় যাস?

খেয়ে আসি। ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। খেয়ে এসেই বিছানায় কান্ত হব। কথাবার্তা যা হবার সকালে হবে। তুই ঘুমো।

সফিক নিচে নেমেও খুব হৈচৈ করতে লাগল, হারামজাদা ডাল শেষ হয়ে গেছে মানে? পয়সা দেই না। আমি? আমি মাগনা খাই? যেখান থেকে পারিস ডাল নিয়ে আয়।

সাধু বাবা ডাল খেয়ে ফেলেছে।

সাধু বাবার বাপের ডাল।

সফিক বড় বদলে গেছে। এ রকম ছিল না। কখনো শরীরও খুব খারাপ হয়েছে। কোনো অসুখবিসুখ বাঁধিয়েছে কিনা কে জানে। আমি তো প্রথম দেখে চিনতেই পারিনি। চমৎকার চেহারা ছিল সফিকের। স্কুলে 'মুকুট' নাটক করেছিলাম আমরা। সফিক হয়েছিল মধ্যম রাজকুমার। সত্যিকার রাজপুত্রের মত লাগিছিল। কমিশনার সাহেবের বৌ সফিককে ডেকে পাঠিয়ে কত কি বলেছিলেন।

২. সফিক আমাকে নিয়ে গেল রশীদ মিয়ার কাছে

সকাল বেলা সফিক আমাকে নিয়ে গেল রশীদ মিয়ার কাছে। রশীদ মিয়া তার রেজিস্ট্রি খাতায় আমার নাম তুলবেন। লোকটি ছোটখাটো। সামনের দুটি দাঁত সোনা দিয়ে বঁধানো। সেই দাঁত দুটি ছাড়া আর সমস্ত দাঁতে কুৎসিত হলুদ রঙ। আমি পান্থনিবাসে বোর্ডার হব শুনে তিনি এমন ভাব করলেন যেন এমন অদ্ভুত কথা এর আগে শোনেননি।

না। সাহেব বোর্ডার আর নেব না। শুধু শুধু ঝামেলা।

কিসের ঝামেলা?

টাকা পয়সা নিয়ে খোঁচামেচি করে।

আমি, আমি খোঁচামেচি করি?

আপনি না করেন। অন্য লোকে করে।

আমাকে নিয়ে কথা। আমি যদি না করি এও করবে না। মাসের তিন তারিখে খ্যাচাং করে টাকা ফেলে দিবে। নবী সাহেবের ঘরটা দেন তার নামে।

নবী সাহেব গেলে তবে তো দিব?

যতদিন না যান ততদিন থাকবে আমার ঘরে।

রশীদ মিয়া অনেকক্ষণ চুপ থেকে বললেন,

ঐ ঘরের ভাড়া এই মাস থেকে পাঁচ টাকা বেশি।

সফিক প্রায় তেড়ে গেল।

পাঁচ টাকা বেশি কেন? মোজাইক করে দিচ্ছেন্ন ঘরটা?

রশীদ মিয়া নির্লিপ্ত সুরে বলল,

জানালা দুইটা। ঐ ঘরে আলো বাতাস বেশি খেলে।

একটা জানালা পেরেক মেরে বন্ধ করে দিবেন। সাফ কথা। খুলেন আপনার খাতা।

নিতান্ত গোমড়া মুখে খাতা খুললো রশীদ মিয়া।

পেশা কী?

আমি আমতা আমতা করে বললাম,

পেশা কিছু নাই – আমি ছাত্র।

ঝপাং করে খাতা বন্ধ করে রশীদ মিয়া আতংকিত স্বরে বললেন,

ছাত্র মানুষ ঘর ভাড়া পাবে কোথায়?

সফিক থমথমে গলায় বলল, যেখান থেকে পারে জোগাড় করবে। দরকার হয় চুরি করবে।

চুরি করবে?

হ্যাঁ, চুরি করবে। অসুবিধা আছে কিছু? আপনি করেন না?

আমি চুরি করি?

মালিকের পান্থনিবাস তো ফাঁকা করে দিচ্ছেন।

রশীদ মিয়ার চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এলো।

কে, কে বলেছে?

বলা বলির তো কিছু নেই। সবাই জানে। সাধুজী তো পরিষ্কার বলেছেন, তীক্ষ্ণ চিবুক, ছোট কান এবং বর্তুলাকার চক্ষুর জাতক চোর স্বভাববিশিষ্ট হয়।

নিশানাথ এই কথা বলে?

হ্যাঁ বলবে না কেন? সাধুজী স্পষ্ট কথার লোক।

এরপর আর আমার নাম-ধাম খাতায় তুলতে অসুবিধা হয় না। রশীদ মিয়া গম্ভীর গলায় উপদেশও কিছু দেন, ঘরে মেয়ে ছেলে আনতে পারবেন না। ভদ্রলোকের মেস এইটা। ধান্ধাবাজির জায়গা না। বিশিষ্ট লোকজন থাকে।

অগ্রিম এক মাসের খাওয়া খরচের টাকা দেয় সফিক। তারপর খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে রশীদ মিয়ার পেটে হাত দিয়ে বলে, মাশআল্লাহ পেট তো আপনার আরো পাঁচ গিরা বড় হয়ে গেছে রশীদ মিয়া। সফিককে যতই দেখি ততই অবাক হই। এ কোন সফিক? দুবৎসরে তার এ কি পরিবর্তন!

মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল একবার। দেখি ঘরের মধ্যে লালচে আলো। সমুদ্র গর্জনের মত শাশা আওয়াজ হচ্ছে। ধরা মড় করে জেগে উঠে দেখি সফিক স্টেভ জ্বালিয়েছে।

কি ব্যাপার সফিক?

ব্যাপার কিছু না, চা খাব।

চা এই সময়? কিয়টা বাজে?

তিনটা দশ। তুই খাবি নাকি?

না।

রোজ এই সময় চা খাস নাকি?

না দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙলো, ভাবলাম একটু চা খাই।

আমি চুপ করে থাকলাম। সফিক ক্লান্ত স্বরে বলল,

বড় স্ট্রগল করতে হচ্ছে। ইউনিভার্সিটি ছেড়ে দিয়েছি জানিস না বোধ হয়?

আমি জানতাম না। স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

কী করে পড়ব বল? দিনে কম্পোজিটারের চাকরি। বিকালে টিউশনি আছে দুটো। এর পর আর এনার্জি থাকে না। নাইট কলেজে পাস কোর্সে নাম তোলা আছে। এই বছর আর হবে না।

সফিক দুটি কাঁপে চা ঢালল। আমি বললাম, এত রাতে চা খাব না। সফিক।

তোর জন্যে না, নিশানাথকে ডেকে আনছি।

কিছুক্ষণ পরই নিশানাথ জ্যোতির্ষিণবের গজগজানি শোনা গেল, বাত দুপুবে চা? এই সব কী শুরু করেছ? যাও চা খাব না।

সফিকের গলা আরেক ধাপ উঁচুতে, বানানো হয়েছে চা খাবেন না মানে? খেতেই হবে।

আরে হুঁকুম নাকি তোমার?

একশ বার হুঁকুম? বানালাম। এত কষ্ট করে আব্বা তিনি খাবেন না। আলবত খাবেন।

সফিকের কাণ্ড কারখানা দেখে আমি স্তম্ভিত। জ্যোতির্ষাণব অবশ্যি খবম খাট খাি্ট কবে ঘবে এলেন। চায়ে চুমুক দিয়ে মুখ বিকৃত করলেন, চা কোথায়? ওয়াক থু। এ তো ইদুব মাবা বিষ।

সফিক সে কথার উত্তর দিল না। খানিকক্ষণ চুপ চাপ থেকে শান্ত স্বরে বলল, একটা গল্প বলুন নিশানাথ বাবু।

জ্যোতির্ষিণব চায়ের কাপ নামিয়ে বেখে উদ্বিগ স্বাবে বললেন, কী হয়েছে তোমার?

কিছু হয় নাই।

না, বল কি হয়েছে?

সফিক ক্লান্ত স্বরে বলল, একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি। দেখলাম আমার ছোট বোন অনু মবে পড়ে আছে। সাত আটটা কাক তার পাশে বসে আছে।

নিশানাথ গম্ভীর হয়ে বললেন, শেষ প্রহরের স্বপ্ন। তার উপর এখন শুক্ল পক্ষ–স্বপ্নের কোনই মানে নেই। নাক ডাকিযে ঘুমাও।

একেবারে যে মানে নেই তা না নিশানাথ বাবু। অনুব হাসবেন্ডটা আরেকটা বিয়ে কবছে। সোমবার চিঠি পেয়েছি। মনটা বড় অস্থির। সন্ধ্যাবেলা আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি, কিছু মনে করবেন না। আমার মাথা ঠিক নাই। নিশানাথ বাবু কিছু বললেন না।

চা শেষ করে নিঃশব্দে চলে গেলেন। আমি শুয়েই ছিলাম, ঘুম আসছিল না। সফিক জেগে রইল অনেকক্ষণ।

এই সফিক কী যে ক্যাবলা ছিল। একা একা স্কুলে আসতে ভয় পেত বলে রোজ তার বাবা স্কুলে দিয়ে যেতেন। টিফিনের সময় আমরা সবাই যখন ছোটাছুটি করে কুমীর কুমীর খেলি, তখন সে উদাস চোখে জানোলা দিয়ে তাকিয়ে থাকে। অংক স্যার একদিন বেগে গিয়ে বললেন, সবাই খেলছে আর তুই বসে আছিস? রহমান যা তো ওর কান মলে দে।

রহমান আমাদের ক্লাস ক্যাপটেন। সে গিয়ে কান চেপে ধরতেই সফিকের নিঃশব্দ কান্না। আমরা হোসে বাঁচি না। একদিন সফিকের বাসায় গিয়ে দেখি তার মা ভাত খাইয়ে দিচ্ছেন। ক্লাস ফোরে পড়ে ছেলে, মায়ের হাত ছাড়া খেতে পারে না! কি কাণ্ড কী কাণ্ড।

আমার ঘুম ভাঙলো খুব সকালে। বাইরে এসে দেখি একটি লোক হাফ পেন্ট পড়ে উঠ বাস করছে। আমাকে দেখে সে মনে হল একটু লজ্জা পেল। ইতস্তত করে বলল, সফিক সাহেবের বন্ধু আপনি?

জি।

আমি আজীজ। রেলে চাকরি করি। শরীরটা ঠিক রাখতে হয় ভাই। যা খাটনি।

আমি কিছু বললাম না। আজীজ সাহেব গায়ের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, আপনার মত রোগা পটকা হলে এত দিনে যক্ষ্মা হয়ে মরে যেতাম। শরীরের জন্যে টিকে আছি। ওয়াগন বুকিং-এর চাকরি যে কবে সেই জানে।

আমি লক্ষ্য করে দেখলাম লোকটির স্বাস্থ্য সত্যি ভাল। সচরাচর এমন চোখে পড়ে না। আমি হাসি মুখে বললাম, বেশ স্বাস্থ্য আপনার।

আর স্বাস্থ্য। খাওয়া জুটিতে পারি না ভাই। শুধু ভিজা ছোলা খেয়ে কী স্বাস্থ্য হয়? সারাক্ষণ ক্ষিধে লেগে থাকে। আসলাম পালোয়ান সকাল বেলা দশটা ডিম আর এক সেরা গোস্তের কিমা খাদ্য। এই সব জিনিস পাব কোথায় বলেন?

আজীজ সাহেব জোর কবে টেনে নিয়ে গেলেন বেলেব সরবত খাওয়ার জন্যে। এতে নাকি পেট ঠাণ্ডা থাকে। আজীজ সাহেবের ঘরটি বেশ বড়। তিনি এবং করিম সাহেব দুজনে মিলে থাকেন। করিম সাহেব লোকটি কংকালসার। মাথায় কোন চুল নেই। কিন্তু মুখ ভর্তি প্রকাণ্ড গোফ।

করিম সাহেব ইনি সফিক ভায়ের বন্ধু, এখানে থাকবেন।

করিম সাহেব হ্যাঁ না কিছুই বললেন না। খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে নিচে নেমে গেলেন। তুমুল ঝগড়া শুরু হয়ে গেল তার পরই। কবিম সাহেব বাঁশীব মত চিকন গলায় চিৎকার করছেন, এত বড় বালতিটা চোখে পরল না?

বালতির মধ্যে নাম লেখা আছে, যে দেখলেই চিনব?

টেরা টেরা কথা বলবেন না।

টেরা কথা কে বলে, আমি না। আপনি?

যত ছোট লোকের আড়া হয়েছে।

মুখ সামলে কথা বলবেন সাহেব।

একজন অতি বৃদ্ধ লোক দেখলাম, কী বলে যেন দু'জনকেই থামাতে চেষ্টা করছেন। আজীজ

উনি নবী সাহেব। গার্লস স্কুলের এ্যাসিসটেন্ট হেড মাস্টার ছিলেন। রিটায়ার করেছেন। অবস্থাটা দেখেছেন? রাতে চোখে একেবারেই দেখতে পান না। হাত ধরে বাথরুমে নিতে হয়।

উনি নাকি ঘর ছেড়ে দিবেন, সফিক বলল।

আজীজ সাহেব গলা নিচু করে বললেন, পাগল হয়েছেন, শিকড় গজিয়ে গেছে। এই ঘর ছেড়ে যাবেন না কোথাও। দুই মেয়ে থাকে ঢাকা–জামাইরা বড় চাকুরে, তারা নেবাব চেষ্টা কম কবে নাই, নিজের চোখে দেখা। ছোট মেয়েটার কত কান্না কাটি...।

নবী সাহেব ঝগড়াটা থামিয়ে ফেললেন। তারপর নিচু গলায় ডাকতে লাগলেন, এই কাদের। এই কাদের। কাদের এই মেসের বাবুর্চি-টাবুর্চি হবে। সে এসে হাত ধরে তাকে উপরে নিয়ে এল। আজীজ সাহেব ফিসফিস করে বললেন, বুড়ার দিন শেষ হয়ে আসছে। হাঁপানি আছে, ডায়াবেটিস আছে, সারারাত খক খ্যক করে কাশে। কিন্তু তেজ কী–মেয়ের বাড়িতে গিয়ে থাকবে না। এত তেজ ভাল না রে ভাই। এখন আরাম নেয়ার সময়, কী বলেন?

তা তো ঠিকই।

বুড়া হলে বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু থাকে না।

সফিক ঘুম থেকে উঠে অন্য মানুষ। হাঁসি-খুশি ভাবভঙ্গি। চা খেতে খেতে বলল,

তোর কোনো চিন্তা নাই, প্রাইভেট টিউশনি ঠিক করে রেখেছি। সপ্তায় পাঁচ দিন যাবি। চোখ বন্ধ করে কলেজে ভর্তি হয়ে যা। শচারেক টাকাও জমিয়েছি। অসুবিধা হবে না। তা ছাড়া আরেকটা

বুদ্ধি বের করেছি।

কী বুদ্ধি?

ছুটির দিনে কাটা কাপড়ের ব্যবসা করব। তুইও থাকবি।

সেটা কী রকম ব্যবসা?

সস্তা দরে দোকান থেকে কাটা কাপড়ের পিস কিনে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে বিক্রি করব। লাভের ব্যবসা। লালু সব ঠিক ঠাক করে দিবে।

লালুকে?

কাটা কাপড়ের ব্যবসা করে। ধুরন্ধর লোক। আমাকে খুব খাতির করে।

আমি হাসি মুখে বললাম, তুই বদলে গেছিস খুব।

সফিক ঘর ফাটিয়ে হা হা করে হাসতে লাগলো।

বদলাবনা তো কী? তুইও বদলাবি। দুবেলা না খেয়ে থাকলেই সব উলট পালট হয়ে যায় বুঝলি। একদিন তো রাস্তায় সুচ বিক্রি করলাম। মজার ব্যাপার খুব।

সফিক সিগারেট ধরিয়ে ফুসফুস করে টানতে লাগল। ওর আগেব সেই সুন্দর চেহারা আর নেই। চোখের নিচে কালি পড়েছে, গালের চোয়ালে উঁচু হয়ে সমস্ত চেহারাটাই কেমন যেন রুক্ষ হয়ে পড়েছে। সফিক হাসি মুখে বলল, সুচ বিক্রির গল্পটা শোন। একেবারে মরণ দশা তখন। চাকরি-বাকরি কিছুই নেই। হাতে জমানে টাকা-পয়সা যা ছিল সব শেষ। পুরা একটা দিন উপোস। দরজা বন্ধ করে খানিকক্ষণ কাদলাম! সন্ধ্যাবেলা বেরিয়েছি রাস্তায়। এমনি সময় এক লোক এসে বলল, সুচ নিবেন ভাই? ছয়টা চাইর আনা। আমি অবাক হয়ে বললাম, সুচ বিক্রি করে চলে তোমার? সেই লোক আমতা আমতা করে না স্যার চলে কই? ঘবে চারজন খানেওয়ালা। সেই রাত্রেই শুরু হল আমার সুচেব ব্যবসা। মূলধন জোগাড় করলাম জ্যোতির্ষিণবের কাছ থেকে। খুব লাভের ব্যবসা। পাঁচ টাকার সুচে দশটাকা লাভ।

লজা লাগত না তোর?

না লজা লাগবে কেন?

পরিচিত কারোর সঙ্গে দেখা হয় নাই?

বেশি দিন সুচ বিক্রি করলে হয়ত হত। বেশি দিন করি নাই। তবে আমাদের ক্লাসের একটা মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল একদিন। পেছন থেকে চিনতে পারিনি। যথারীতি বলেছি, আপা সুচ নেবেন, সস্তা করে দিচ্ছি। মেয়েটি ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে দেখে একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। অনেক্ষণ কথাই বলতে পারল না। শেষটায় বলল, কাল সন্ধ্যায় একবার আমার বাসায় আসবেন? আসেন না। ঠিকানা রাখেন। আসবেন কিন্তু।

গিয়েছিলি?

গেলাম। রাজপ্রাসাদের মত বাড়ি। দেখলেই বুকের মধ্যে হুঁ হুঁ করে। মেয়েটিকে দেখে কে বলবে ওদের এত পয়সা। দারুণ মন খারাপ হয়ে গেল।

মেয়েটি সেই রাত্রেই কম্পোজিটারের একটা চাকরি জোগাড় করে দিল। প্রেসের মালিককে কী বলেছিল কে জানে, যাওয়া মাত্র এক মাসের এডভান্স বেতন।

মেয়েটা তো খুব ভাল।
ই ভাল মেয়ে। তোকে একদিন নিয়ে যাব।
সফিককে নিয়ে সেই দিনই কলেজে ভর্তি হয়ে গেলাম। কলেজের প্রিন্সিপাল গম্ভীর মুখে বললেন, তিন বছর লস দিয়েছ দেখছি। এই তিন বৎসর করেছ কী?

কান টান লাল হয়ে গেল আমার। নিজের অভাব অনটনের কথা আমি নিজে মুখ ফুটে কখনো বলতে পারি না।

পুরানো বইয়ের দোকান থেকে কিছু বইপত্র জোগাড় করলাম। যে বাড়িতে প্রাইভেট টিউশনি জোগাড় হয়েছে সে বাড়িতেও সফিক আমাকে নিয়ে গেল। নয় দশ বছরের একটি মেয়ে আর ক্লাস ওয়ানের একটি ছেলেকে পড়াতে হবে। এদের মা নেই। বাবা ব্যস্ততার মধ্যে সময় করতে পারেন না। ভদ্রলোক বললেন, দুটিই ভীষণ শয়তান, অস্থির হয়ে পড়েছি আমি। দেখেন ভাই যদি কিছু করতে পারেন। বাচা দুটিকে ভাল লাগল। ছোটটি দেখি একটি পেনসিল দিয়ে বোনকে খোঁচা দেয়ার চেষ্টা করছে। বড়টির মুখের ভাব এরকম যে এই সব ছেলেমানুষী ব্যাপার দেখে সে বড়ই বিরক্ত। বাচ্চা দুটির খুব মায়া কাড়া চেহারা।

পান্থ নিবাসে ফিরে এলাম অনেক রাতে। জ্যোতির্ষিণবের ঘরে প্রদীপ জ্বলছে, তার মোটা গম্ভীর গলা শোনা যাচ্ছে, আপনার রবির ক্ষেত্রে ত্রিশুল চিহ্ন আছে। অতি শুভ লক্ষণ। হাজারে একটা পাওয়া যায় না। তবে মঙ্গলের ক্ষেত্র ভাল না। গ্রহ কুপিত হয়েছেন।
আজীজ সাহেবের ঘরে হৈ হৈ করে তাস খেলা হচ্ছে। তীক্ষা গলায় কে যেন চোঁচাচ্ছে, এটা নো ট্রাম্পের কল? মাথার মধ্যে কিছু আছে আপনার? গোবর পুরা মাথায় অফিসের কাজকর্ম করেন কী ভাবে?
বারান্দায় পাটি পেতে লম্বা শুয়ে শুয়ে আছেন করিম সাহেব। কাদের তার গায়ে তেল মাখাচ্ছে। আরামে চোখ ছোট হয়ে আসছে করিম সাহেবের। আমাদের দেখে টেনে টেনে বললেন, তেল মালিশের মত উপকারী কিছু নাই। দুইটাই চিকিৎসা আছে, জলি চিকিৎসা আর তেল চিকিৎসা।

পান্থ নিবাসে আমার জীবন শুরু হল। ১১ই মার্চ উনিশশো পয়ষট্টি সন।

৩. বাড়ি থেকে চিঠি এসেছে

বাড়ি থেকে চিঠি এসেছে।

বাবা এবং মা দুজনেই দুটি পৃথক খামে চিঠি দিয়েছেন। বাবার চিঠি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। সে চিঠিতে নিজের ছেলে-মেয়ের কথা কিছুই নেই। স্টেশন মাস্টার এবং পোস্ট মাস্টারের কথা বিশদভাবে লেখা। বাবা লিখেছেন,

বেহালার দাম কত তা নিশ্চয়ই খোঁজ নিয়াছ। ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিবে এবং বেজিস্টাবি চিঠি দিয়া আমাকে জানাইবে। এদিকের খবর ভাল তবে স্টেশন মাস্টার সাহেবের বড় বিপদ। তার চাকরি নিয়া ঝামেলা হইতেছে। হেড অফিস হইতে ইন্সপেকশন হইবে। বড় উদ্বিগ্ন আছি। আমাদের পোস্টমাস্টার সাহেবের মেজো মেয়ের বিবাহের দিন ধার্য হইয়াছে। ছেলে কাস্টমাসে চাকুরি করে। তিনশত পচাত্তর টাকা বেতন। পনরই ফায়ুন ইনশাল্লাহ বিবাহ, দেনা-পাওনা নিয়ে ছেলের এক মামার সহিত কিঞ্চিৎ মানো-মালিন্য হইয়াছে। মামাটি অতি অভদ্র। সাক্ষাতে সমস্ত বলিব।

মায়ের চিঠিটাও ছোট আমার পড়াশুনা নিয়ে উদ্বেগ। স্বাস্থ্য কেমন আছে। এখানকার খাওয়া দাওয়া কেমন, এই সব। কিন্তু শেষের দিকে লিখেছেন,

তোমার বাবার স্বাস্থ্য বিশেষ ভাল না। খাওয়া দাওয়ায় ইদানীং খুব অনিয়ম করেন। আমার সন্দেহ হয় তাহার অল্প অল্প মাথার দোষ দেখা দিয়াছে। পরে বিস্তারিত লিখিব।

চিঠি পড়ে খুব মন খারাপ হয়ে গেল। মা নিশ্চয়ই অনেক কিছু গোপন করেছেন। খুব অস্থির লাগল। সফিকের সঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন। কিন্তু সে আসবে রাত এগারোটার দিকে। বারান্দায় চেয়ার টেনে চুপচাপ বসে রইলাম। চার পাঁচ মাসে বাবার এমন কী হতে পারে যাতে মা ভেবে বসেছেন। বাবার মাথার দোষ হয়েছে। তা ছাড়া সংসার চলছে কি ভাবে সেই প্রসঙ্গেও কেউ কিছু লিখেন নি। জমির আয় অতি সামান্য। মামারা মাঝে মাঝে টাকা দিয়ে সাহায্য করেন। এখনো করছেন। কিনা কে জানে? পারুলের স্কুলের বেতন দেয়া হয়েছে কী? না নাম কাটিয়ে বাড়িতে বসে আছে। কিছু দিন আগে পারুলের চিঠি পেয়েছি সেখানে এসব কিছুই লেখা নেই। বাড়ির জন্যে বড় মন কাঁদতে লাগল।

জ্যোতির্ষিণবের কাছে একটু যে বসব সে উপায় নেই। তাঁর নাকি আবার কি এক মৌনব্রত শুরু হয়েছে। এক সপ্তাহ কারো সঙ্গে কথা বলবেন না। হাত দেখাতে যারা আসছে তাদের ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে। সফিক মৌনব্রতের প্রথম দিন চেঁচিয়ে বলেছে,

শুধু ভড়ং, রোজগার পাতি নাই কিনা তাই একটা নতুন ফিকির বের করেছে।

এর উত্তরে জ্যোতির্ষিণবশ্লেটে বড় বড় করে লিখেছেন, মৌনব্রত অবস্থায় আমাকে রাগাইও না।

সেই শ্লেট রেখে এসেছেন। সফিকের বিছানায়। সফিক রেগে মেগে অস্থির। তার এরকম রাগের অর্থও ঠিক বুঝতে পারি না। রোজগার বাড়াবার ফন্দিই যদি হয় তাতে ক্ষতি কী? ফন্দি ফিকির তো সবাই করে। তা এমনিতেও তার খুব তিরিক্ষি মেজাজ হয়েছে। কোন কারণ ছাড়াই রেগে ওঠে। করিম সাহেবের সঙ্গে অকারণে একটা ঝগড়া করল। করিম

সাহেব রোজকার মত সন্ধ্যা বেলা গায়ে তেল মাখাচ্ছিলেন। সফিক গম্ভীর হয়ে বলল, এই কুৎসিত অভ্যাসটা ছাড়েন দেখি।

আপনার তো কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

ঘরের সামনে একটা লোক নেংটা হয়ে তেল মাখায়–এটা সহ্য করা যায় না।

আমি নেংটা হয়ে তেল মাখাই। আমি?

তুমুল হৈচৈ বেঁধে গেল। নবী সাহেব এসে থামালেন।

সফিকের প্রেসের চাকরিটা নেই। কী নিয়ে গোলামাল করেছে কে জানে? লালুর সঙ্গে কাটা কাপড়ের ব্যবসা শুরু করেছে। সারাদিন রোদে দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে। সন্ধ্যার পর যায় বয়স্কদের কী একটা স্কুলে। এই চাকরিটা সে কি করে যেন ধ্যা করে জোগাড় করে ফেলেছে। মিউনিসিপ্যালিটি থেকে মাসে তাকে একশ টাকা করে যাতায়াত খরচ দেয়। এর বিনিময়ে বস্তির লোকদের সে বর্ণ পরিচয় পড়ায়। এই চাকরিতে সে খুব সন্তুষ্ট। হাসি মুখে আমাকে বলে,

সব গুণ্ডা-পাণ্ডাদের সঙ্গে খাতির হয়ে গেছে অনেকেই আমার ছাত্র কিনা। খুব মানে। দেখবি ওদের দিয়ে নিউ প্রেসের মালিককে রাম ধোলাই দিব একদিন। আর আমাদের রশীদ মিয়াকেও।

রশীদ মিয়া আবার কী করেছে?

মস্ত বড় চোর। দেখ না কী করি শালাকে।

আমার মনে হয় সফিকের কোনো একটা অসুখ করেছে। রাতে তার ভাল ঘুম হয় না–ছট ফট করে। প্রায়ই দেখা যায় অন্ধকার ঘরে স্টেভ জ্বালিয়ে চা করছে। রাতের বেলা তার চা খাওয়ার সঙ্গী নিশানাথ বাবু। দুজনে চুক চুক করে অন্ধকারে চা খায়-আবার ঝগড়াও করে।

আমি প্রাণপণ চেষ্টা করি পড়াশুনা করতে। কিন্তু কিছুতেই মন বসে না। ক্লাসে বড় ঘুম পায়। প্রফেসররা একঘেয়ে সুরে কি বলেন তারাই জানেন। একেক সময় এমন নির্বোধ মনে হয় তাদের। ক্লাস ফাঁকি দিয়ে প্রায়ই চলে যাই সদরঘাট। লঞ্চ টার্মিনালের কাছে সফিক লালুকে নিয়ে কাটা কাপড় বিক্রি করে। জায়গাটা নাকি ভাল। ঘরে ফেরা মানুষেরা বেশি দরদাম করে না। ঝটপট কিনে ফেলে। আমাকে দেখলেই সফিক বিরক্ত হয়। গম্ভীর হয়ে বলে, ক্লাস ফাকি দিয়ে আসলি? মুশিবত দেখি। ক্লাসে যেতে সত্যি আমার ভাল লাগে না। কলেজের ছেলেগুলিকে আপন মনে হয় না কখনো। অনেক বেশি ভাল লাগে পান্থ নিবাসের লোকজনদের। এদের সাথে আমার পরিচয় অল্পদিনের-তবু মনে হয় যেন কত কালের চেনা। সিরাজ সাহেবের কথাই ধরা যাক। বয়সে আমার চেয়ে দশ বারো বৎসরের বড়। কিন্তু আমার সঙ্গে এমন ভাবে কথা বলেন, যেন আমি তার দীর্ঘ দিনের বন্ধু। পয়ত্রিশের মত বয়স হয়েছে। বিয়ে করেছেন মাত্র গত বৎসর। বিয়ের প্রসঙ্গ উঠলেই লাজুক ভঙ্গিতে বলেন, শুধু পয়সার অভাবে দেরি করলাম। কিন্তু বড় বেশি দেরি করে ফেলেছি। বউটার বয়স অল্প রে ভাই। মনে মনে বোধহয় কষ্ট পায়–বুড়ো হাসবেন্ড।

সিরাজ সাহেব প্রতি শনিবারে দেশে যান। সোমবার সকালে এসে অফিস ধরেন। শুক্রবার বিকালে তাঁর সঙ্গে বাজারে যেতে হয় আমাকে। খুটিনাটি কত কি যে দীরদাম করেন। মুখে কপট বিরক্তির রেখা।

বুঝলেন ভাই বিয়ে করার যন্ত্রণা! বাজারে ঘুরতে ভাল লাগে বলেন দেখি? গতবার যে নিয়ে গেলাম। লাল ফিতা? পছন্দ হয় নাই। রঙটা নাকি কটা। মেয়েদের মনের ঠিক পাওয়া মুশকিল রে ভাই।

সিরাজ সাহেবের বেঁটির আবার গল্পের বই পড়ার নেশা। মাঝে মাঝেই বই নিয়ে যাওয়ার ফরমাশ থাকে। বইয়ের দোকান ঘুরতে ঘুরতে ঘাম বেরিয়ে যায় আমার, বই আর সিরাজ সাহেবের পছন্দ হয় না। যে বই দেখানো হয়, সিরাজ সাহেব ঘাড় নাড়েন,–উঁহু মলাটে এটা পাখির ছবি নাকি? এই বই ভাল হবে কী করে ভাই? একটা ট্র্যাজিক বই দেখান না।

এমন সব অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস কেনার কথা মনে হয় সিরাজ সাহেবের। একবার কিনবেন সন্দেশ তৈরির ছাঁচ। সদরঘাট আর নিউ মার্কেট চষে ফেললাম দুজনে— কোথাও পাওয়া যায় না। সিরাজ সাহেবের মুখ শুকিয়ে পাংশু।

খুব করে বলে দিয়েছে নিতে। সখা হয়েছে একটা, ছেলেমানুষ তো। শেষ পর্যন্ত চক বাজারে পাওয়া গেল। সিরাজ সাহেবের গাল ভর্তি হাসি, যেন গুপ্তধন পেয়েছেন।

রাতে টিউশনি থেকে ফিরার পর সিরাজ সাহেব একবার আসবেনই আমার ঘরে। হাসি মুখে বলবেন, বারান্দায় হাওয়ার মধ্যে খানিকক্ষণ বসবেন নাকি রঞ্জু ভাই? পড়াশুনার ক্ষতি হলে থাক।

আমি রোজই গিয়ে বসি। এ-কথা সে-কথার পর সিরাজ সাহেব এক সময় বৌয়ের কথা এনে ফেলেন।

কোয়ার্টার পেলে নিয়ে আসতে হবে। ছেলেমানুষ একা একা থাকতে পারে বলেন দেখি? তার ওপর তার আবার ভূতের ভয়।

শিগগিরই পাবেন কোয়ার্টার?

অফিার্সাস গ্রেডে গেলেই পাব। সুন্দর কোয়ার্টার। বেড রুম দুইটা। বারান্দা আছে। ফুলের টব রাখা যায়। আপনার ভাবীর আবার গাছের সখ।

তাই নাকি?

আর বলেন কেন! গাছের নামে অজ্ঞান। এইবার হুঁকুম হয়েছে। রজনীগন্ধার চারা নিতে হবে। বিয়ে করার যে কি ঝামেলা, বিয়ে না করলে বুঝবেন না।

সিরাজ সাহেব কপট বিরক্তিতে মুখ অন্ধকার করতে চেষ্টা করেন। বারান্দার আবছায়া অন্ধকারেও কিন্তু তার হাসিমুখ ঢাকা পড়ে না। বড় ভাল লাগে আমার।

একবার ভাবীকে দেখতে যাব আমি আপনার সঙ্গে।

অবশ্যই অবশ্যই। এই শনিবারেই চলেন। কী যে খুশি হবে। না দেখলে বিশ্বাস করবেন না। ওর কাছে আপনি পর কিছু নাই–সবাই আপন। যেতে হবে কিন্তু ভাই, ছাড়ব না আমি।

শনিবারে কিন্তু সিরাজ সাহেব যেতে পারলেন না। অফিসের কাজ পড়ে গেল। হঠাৎ করে। মুখ কালো করে ঘুরতে লাগলেন। রাতে খেতে পারলেন না। মোটেই নাকি ক্ষিধে নেই। রোববার ভোরে দেখি তার চোখ বসে গেছে। দিশেহারা ভাব। সারারাত নাকি ঘুম হয়নি। খুব আজেবাজে স্বপ্ন দেখেছেন, দেখেছেন যেন একটা মস্ত বড় সাপ রেখাকে ছোবল দিচ্ছে। মনটা বড় অস্থির ভাই। চলেন দেখি নিশানাথের কাছে যাই।

নিশানাথ গম্ভীর মুখে শুনলেন সব কিছু। তার ভাব দেখে মনে ভরসা পাওয়া যায় না। কিন্তু কথা বললেন খুব নরম গলায়, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মন তো— তাই এই সব দেখেছেন। এই সব কিছু না। শনিবার তো এলো বলে। বড় সাহেবকে বলে এই বার একদিন বেশি থেকে আসবেন।

কিন্তু পরের শনিবারে সিরাজ সাহেবকে অফিসের কাজে খুলনা চলে যেতে হল। সোমবার সন্ধ্যায় ফিরলেন। আমরা সিরাজ সাহেবের দিকে তাকাতে পারি না। নবী সাহেবের মত মানুষ পর্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, দেশে একটা টেলিগ্রাম করে দাও। চিন্তা করবে তো।

সিরাজ সাহেব দার্শনিকের মত মুখ করে বললেন, টেলিগ্রাম আর করে কি হবে?

পান্থ নিবাসের জীবনযাত্রা খুব একঘেয়ে বলেই বোধ হয়। সোমবার ভোরে আমাদের বিস্ময়ের সীমা রইল না। সবাই অবাক হয়ে দেখলাম রিকশা থেকে একটি ফুট ফুটে মেয়ে নামছে। এমন মায়া কাড়া চেহারা। হলুদ রঙের একটি শাড়িতে দারুণ মানিয়েছে। যদিও কেউ আমাকে কিছু বলেনি। তবু বুঝলাম। এই মেয়েটিই সিরাজ সাহেবের বৌ। একটা হুঁলস্থূল পড়ে গেল আমাদের মধ্যে। নিশানাথ জ্যোতির্ষিণব সিরাজ সাহেবকে ভাই বলে ডাকেন। তিনি অবলীলায় বলতে লাগলেন, এসো মা এসো। আসবে সিরাজ। যাবে কোথায়? অফিসের কাজে আটকা পড়ায় যেতে পারেনি। আজও সকাল সকাল চলে গেছে। এক্ষুণি আনতে লোক যাবে।

সিরাজ সাহেবের বেঁটি অল্প সময়ের মধ্যে সহজ হয়ে গেল। নিশানাথ বাবু এবং নবী সাহেব দু'জনকেই সে এমন সুরে চাচাজান ডাকতে লাগল যেন বহু দিন পর হারানো চাচা ফিরে পেয়েছে। নবী সাহেব দুবার রান্নাঘরে গিয়ে তদারক করলেন নাস্তা পানি কি দেয়া হবে। সফিক চলে গেল সিরাজ সাহেবের অফিসে। করিম সাহেব গম্ভীর হয়ে ঘোষণা করলেন, আজ আর তিনি অফিসে যাবেন না। দুপুরের খাবারটা যেন ভাল হয় সেটা দেখাশোনা করা দরকার। কাঁদেরের ওপর ভরসা। করা যায় না। মেয়েটি মনে হল অভিভূত হয়ে পড়েছে। সে কখনো ভাবেনি এমন একটা সমাদর তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। সবার সঙ্গে সে এমন ভাব করতে লাগল যেন সেই পান্থ নিবাসে দীর্ঘদিন ধরে আছে। এখানকার সবাই তার চেনা।

সফিক সিরাজ সাহেবকে সঙ্গে করে এগারোটার দিকে এল। সিরাজ সাহেবকে কিছুই বলেনি সে। সিরাজ সাহেবের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। তিনি কাঁপা গলায় বললেন, আমার নাকি দুঃসংবাদ আছে?

জ্যোতির্ষিণবের দাড়ির ফাঁকে হাসি খেলে গেল। তিনিও যথাসম্ভব গম্ভীর গলায় বললেন, যান দেখি সাহেব আমার ঘরে। দুঃসংবাদ তো আছেই। ঘরে গিয়ে বসেন ঠাণ্ডা হয়ে বলছি।

সিরাজ সাহেব ঘরে ঢুকতেই ঝপাং করে দরজা বন্ধ করে ফেলা হল। জ্যোতির্ষাণবের হাতে তালা মজুদ ছিল। তালা লাগিয়ে দেয়া হল দরজায়। আমাদের সমবেত হাসির শব্দে রাস্তায় লোক জমে গেল।

রাতের বেলা খেতে গিয়ে দেখি ফিস্টের ব্যবস্থা। এ মাসের বাজারের ভার আজীজ সাহেবের হাতে। তিনি কাউকে না জানিয়ে ফিস্টের ব্যবস্থা করেছেন। বাকি মাস সাবধানে বাজার করে তিনি নাকি সব পুষিয়ে নেবেন।

পান্থনিবাসে নিজেদের দুঃখ কষ্ট আমরা ভুলে থাকার চেষ্টা করি। তবু একেক বার মন ভেঙে যেতে চায়। বাড়ির চিঠি পড়ে আমার আজ বড় কষ্ট হচ্ছে। হাতে একেবারেই টাকা-পয়সা নেই। থাকলে আজ রাতেই বাড়ি চলে যেতাম। প্রাইভেট মাস্টারিটা ভাল লাগছে না। ভদ্রলোক কিছুতেই টাকা দিতে চান না। বেতন দেবার সময় হলেই অম্লান বদনে বলেন, এই মাসে একটা ঝামেলা আছে-সামনের মাসে নেন।

পরের মাসেও তার হাতে টাকা থাকে না। অল্প কিছু দিয়ে বলে, বাকি টাকাটা দিন সাতেক পরে চেয়ে নেবেন।

দিন সাতেক পর টাকা চাইলে মহা বিরক্ত হয়ে বলেন,

মাসের মাঝখানে আমি টাকা পাই কোথায় বলেন দেখি? বিচার বিবেচনা তো কিছু আপনার থাকা দরকার।

পড়াবার সময় কাছে বসে থাকেন। বাচ্চা দুটি এক সময় ঘুমে ঢুলতে থাকে। আমি উঠতে চাইলেই গম্ভীর হয়ে বলেন, এখনই উঠবেন কি দশটা তো বাজে নাই! হাতের লেখাটা আর একবার লেখান।

বাচ্চাদের উঠিয়ে নিয়ে চোখে পানির ঝাপ্টা দিয়ে আবার এনে বসান। মেয়েটি করুণ চোখে তাকায় আমার দিকে। বড় মায়া লাগে।

সফিকের সঙ্গে কথা বলে মাস্টারিটা ছেড়ে দিতে হবে। ওর সঙ্গে দিনের বেলা কাটা কাপড়ের ব্যবসা করে রাতে নাইট কলেজে পড়ব। সফিকের যদি লজ্জা না লাগে আমার লাগবে কেন? বাড়িতে সাহায্য করতে হবে।

আজ আর পড়াতে না গিয়ে সফিকের জন্য বারান্দায় মোড়া পেতে বসে রইলাম। করিম সাহেব আজও গায়ে তেল মেখে বারান্দায় মাদুরের উপর শুয়ে আছেন। আমার সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করলেন, নিশানাথের মাথায় এক বালতি ঠাণ্ডা পানি ঢাললে দেখবেন, মৌনব্রত কোথায় গেছে। ফর ফর করে কথা বলবে বুঝলেন, এসব ধান্ধাবাজি আমার কাছে বলবে না।

আমি চুপ করে রইলাম। করিম সাহেব বললেন, আরে ভাই লোক চরিয়ে খাই, আমার সঙ্গে চালাকি? মৌনব্রতের পাছায় লাথি।

সফিক ফিরল অনেক রাতে। চোখে-মুখে দিশেহারা ভাব। গায়ে আকাশ পাতাল জ্বর। জ্যোতির্ষাণব তার গায়ে হাত দিয়েই মৌনব্রত ভেঙে ফেললেন, চেঁচিয়ে বললেন, পানি ঢালতে হবে মাথায়। আর ডাক্তার লাগবে একজন।

সফিক চিচি করে বলল, ডাক্তার দেখিয়েই এসেছি। প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়েছে, টাকা থাকলে ওষুধ আনান। আমার কাছে নাই কিছু।

জ্বর বাড়তেই থাকল। সফিক আরক্ত চোখে নিশানাথের দিকে তাকিয়ে বলল, আয়ু রেখাটা দেখেন দেখি ভাল করে। এত সকাল সকাল মরলে হবে না। কাজ অনেক বাকি আছে।

নবী সাহেব, আজীজ সাহেব, করিম সাহেব সবাই এসে ভীড় করে দাঁড়াল। আমি জুরের গতি দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

কিন্তু আশ্চর্য শেষ রাতের দিকে ঘাম দিয়েই জ্বর ছেড়ে গেল। সফিক ভাল মানুষের মত উঠে বসে বলল, ক্ষিধে লেগেছে, কি খাওয়া যায় বলেন দেখি নিশানাথ বাবু।

নিশানাথ জ্যোতির্ষিণব আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে ফিসফিস করে বললেন, বডড ঝামেলা হয়ে গেছে রঞ্জু। ভয়ের চোটে মানত করে ফেলেছিলাম। আজ রাতে জ্বর কমলে কাল দুপুরেই কাঙালী ভোজন করাব। হাতে পয়সা-কড়ি মোটেই নাই। এদিকে জ্বর তো দেখি কমেই গেছে। তারা মা ব্রহ্মময়ী একি বিপদে ফেললে আমাকে!

৪. শীতের শুরুতে বাবা এসে হাজির

শীতের শুরুতে বাবা এসে হাজির।

খোঁচা খোঁচা দাড়ি সারা মুখে। গায়ে একটা ময়লা কোট। স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে গেছে। চেনা যায় না এমন।

মায়ের চিঠিতে স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা যে এতটা কল্পনাও করিনি। নিচের পাটির একটি দাঁত পড়ে গিয়ে এমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে তাকে!

ও রঞ্জু কেমন আছিস তুই? কতদিন পর দেখলাম।

আমি অনেকক্ষণ কোন কথাই বলতে পারলাম না। বার বার মনে হল বাবার মাথার দোষটা হয়তো সেরে গেছে। না। সারলে এত দূরে ঠিকানা খুঁজে খুঁজে এলেন কী করে? তবু সন্দেহ যায় না। বার বার জিজ্ঞেস করি, মাকে বলে এসেছেন তো বাবা? না বলে আসিনি তো?

বাবা পরিষ্কার কোন উত্তর দেন না। একবার বলেন, হ্যাঁ বলেছি তো। আবার বলেন, বলব কি করে? তোর মা কথা বলে না। আমার সঙ্গে। ভাত খাওয়ার সময় আমি সামনে থাকলেও বলে, পারুল তোর বাবাকে খেতে বল।

আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বাবাকে লক্ষ্য করি। কথাবার্তা বেশ স্বাভাবিক। আমার পরীক্ষা কবে, পড়াশুনা কি রকম করছি, এইসব খুব আগ্রহ করে জিজ্ঞেস করলেন।

রাতে হোটেলে ভাত খাওয়াতে নিয়ে গেলাম। সারাপথ গল্প করতে করতে চললেন। এখন আর গল্পের ধরন সে রকম স্বাভাবিক মনে হল না। যেন নিজের মনেই কথা বলছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, বাড়ির সবাই ভাল আছেন। বাবা? বাবা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, হ্যাঁ সবাই ভাল। স্টেশন মাস্টারের ছোট ছেলেটার হুঁপিং কফ হয়েছে।

পারুল, পারুল কেমন আছে? তার পরীক্ষা কবে?

জানি না তো। ভাল আছে নিশ্চয়ই।

আমি অবাক হয়ে বলি, পারুল কেমন আছে জানেন না বাবা? কী বলছেন এসব?

কী করে জানব, বোকার মত কথা বলিস? পারুলের বিয়ে হয়ে গেছে না?

আমি স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকি। এসব কী শুনছি?

কী বলছেন। আপনি? কিসের বিয়ে?

গত শুক্রবার পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে ফেলেছে। তোর মার এমন ভ্যাজর ভ্যাজার–পুলিশে খবর দাও, পুলিশে খবর দাও। মেয়েছেলেদের বুদ্ধি তো।

আমি বেশ খানিকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলাম না। ভাবতেও পারছিলাম না তারা আমাকে একটা খবর জানানোর প্রয়োজন পর্যন্ত মনে করল না।

ছেলেটা ভাল। বেশ ভাল। পারুলকে নেত্রকোনায় নিয়ে গেছে। আমি ওদের কেন সঙ্গে গৌরীপুর পর্যন্ত গেলাম। আমার টিকিট লাগে না। ট্রেনের চেকাররা সবাই আমাকে চিনে। খুব খাতির করে।

বাবার কথাবার্তা শুনে চোখে পানি এসে গেল আমার। পারুলের মত মেয়ে এই করবে? পনের বছর যার বয়স! খবর দিলেন না কেন বাবা? একটা টেলিগ্রাম তো করতে পারতেন।

বাবা শান্ত স্বরে বললেন, তোর মা বলল, টেলিগ্রাম করলে শুধু শুধু দুঃশ্চিন্তা হবে। আমি চিঠি লিখব। মেয়ে মানুষের এরচে বেশি বুদ্ধি কী হবে? হলে তো আর মেয়েছেলে থাকত না। পুরুষই হয়ে যেত।

মায়ের চিঠি পৌঁছবার আগেই পারুলের চিঠি এল। নেত্রকোনা থেকে লিখেছে। লম্বা চিঠি। কিন্তু কোথাও নিজের বিয়ের কথা কিছু নেই। একবারও লিখেনি যে সে একটা ভুল করে ফেলেছে। তার দীর্ঘ চিঠির মূল বক্তব্য হচ্ছে, বাড়ির অবস্থা খুব খারাপ। মামারা টাকা পয়সা দেয়া বন্ধ করেছেন। আমি যেন যে ভাবেই হোক প্রতি মাসে মাকে টাকা পাঠাই। প্রয়োজন হলে কলেজ ছেড়ে দিয়েও যেন একটা চাকরি জোগাড় করি। বড় ডাক্তার দেখিয়ে যেন অতি অবশ্যি বাবার ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা করি। চিঠির শেষে পুনশ্চ দিয়ে লেখা, দাদা দেখবে একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে। আজকে আমার ওপর রাগ হলেও— সেদিন আর রাগ থাকবে না।

মায়ের চিঠিটি পাঁচ পাতার। ব্যাপারটি কি ভাবে ঘটল তা নিখুঁতভাবে লেখা। বৃহস্পতিবার সারাদিন পারুল নাকি শুয়ে শুয়ে কেন্দেছে। মাকে বলেছে পেটে প্রচণ্ড ব্যথা। শুক্রবার সকালে পরিষ্কার দেখে একটা শাড়ি পরে অঞ্জকে পুকুর ঘাটে নিয়ে একটি টাকা দিয়ে

বলেছে ইচ্ছেমত খরচ করতে। মা একবার খুব ধমক দিলেন। পরিষ্কার শাড়িটা নষ্ট করছে সেই জন্যে। পারুল কিছু বলে নাই। দুপুরে খাওয়ার পর মাকে গিয়ে বলেছে, মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে বড্ড মাথা ধরেছে। মা ধমক দিয়ে সরিয়ে দিয়েছেন। তারপর বিকালে ঘুম থেকে উঠে দেখেন পারুল ঘরে নেই ...

সফিক সব কিছু শুনে বলল, তোর বোনটার তাহলে বুদ্ধি আছে দেখি?

বুদ্ধির কী আছে। এর মধ্যে?

বিয়ে করে নিজে বেঁচেছে তোদেরও রিলিফ দিয়েছে।

পরীক্ষণেই সে পারুল প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে উদ্বিগ্ন স্বরে বললো, প্রতি মাসে তোর মাকে টাকা পাঠাতে হবে। এইটি খুবই জরুরি। আমি অবাক হয়ে বললাম, কোথেকে পাঠাব? টাকা কোথায়?

সবাই মিলে একটা চায়ের সন্টল দিয়ে ফেলি। আয়। খোঁজ নিয়েছি ভাল লাভ হবে। ম্যানেজার করে দেব নিশানাথকে। নিশানাথের দাড়ি গোফ দেখেই দেখবি হুঁড় হুঁড় করে কাস্টমার আসবে। চা বানিয়ে কুল পাওয়া যাবে না।

বলে কী সফিক। নিশানাথ জ্যোতির্ষিণব চায়ের দোকান দেবে? সফিককে দেখে মনে হল তার মাথার প্ল্যান খুব পাকা।

কাটা কাপড়ের ব্যবসাটা মাঠে মারা গেছে। ভাত খাওয়ার পয়সা নাই লোকে কাপড় কিনবে কী?

আমি বললাম, জ্যোতির্ষিণব বুঝি চায়ের দোকান খুলবে তোর সাথে?

না খুলে যাবে কোথায়? একটা লোক আসে না তার কাছে। ব্যাটার এখন ধূপ কেনার পয়সা নাই। সফিক ঘর কাঁপিয়ে হাসতে লাগল। যেন খুব একটা হাসির ব্যাপার হয়ে গেছে। জ্যোতির্ষিণবের এমন দুর্দিন যায়নি কখনো। সঞ্চয় যা ছিল উড়ে গেছে। সখের টেবিল ফ্যানটি বিক্রি করেছেন করিম সাহেবের কাছে। আমাকে গম্ভীর হয়ে বললেন, সাধু সন্ন্যাসী মানুষদের জন্যে এই সব কিছু দরকার নাই। আমাদের কাছে হিমালয়ের গুহাও যা আবার সাহারা মরুভূমিও তা, ফ্যানের কোন প্রয়োজন নাই।

মিল চার্জ বাকি পড়ায় গত শনিবার থেকে খাওয়া বন্ধ। পরশু দুপুবে তাঁর ঘরে ঢুকে দেখি একটা শুকনো পাউরুটি চিবোচ্ছেন। আমাকে দেখে দারুণ লজ্জা পেয়ে গেলেন। কান টান লাল করে বললেন, আমিষ বর্জন করলাম, রঞ্জু। জ্যোতিষ শাস্ত্রের মত গূঢ় বিদ্যার চর্চা করলে মাছ মাংস সমস্ত বর্জন করতে হয়। আমার ঠাকুর দা শ্রী শ্রী তারানাথত চক্রবর্তী সমস্ত দিনে এক মুঠি আলো চালের ভাত আর একবাটি দুধ খেতেন। কি বিশ্বাস হয়? আমিষ একবার বর্জন করে দেখ শরীর ঝর ঝরে হয়ে যাবে।

রশীদ মিয়া উচ্ছেদের নোটিশ দিয়েছে। নিশানাথ বাবুর নাকি তিন মাসের সিট রেন্ট বাকি। জ্যোতির্ষিণব শুনলাম অতি গম্ভীর ভঙ্গিতে বলছেন, আর একটি মাস রশীদ মিয়া। এর মধ্যেই আমার মঙ্গল হোরায় প্রবেশ করবে। রবির ক্ষেত্র আবার...

আরে রাখেন। সাহেব মঙ্গল আর রবি। পনেরো দিন সময়। এর মধ্যে পারেন দিবেন না পারেন বিসমিল্লাহ বিদায়। তিন মাসের সিট রেন্ট আপনার দেওয়া লাগবে না।

জ্যোতির্ষিণবের এমন খারাপ সময় যাবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি। তাকে টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করা যারে না। দান এবং ঋণ গ্রহণ, এই দুই জিনিস নাকি তার জন্যে নিষিদ্ধ। সফিক সবার সঙ্গে পরামর্শ করে বাংলা দৈনিক সব কটিতে বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে দিল। একদিন পর পর সে বিজ্ঞাপন ছাপা হল এক সপ্তাহ পর্যন্ত।

‘পাক ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত জ্যোতিষ–শ্রী নিশানাথ চক্রবর্তী, জ্যোতির্ষিণব। এম. এ. (ফলিত গণিত) বহু রাজা মহারাজার প্রশংসাপত্র আছে। আসুন পরীক্ষা করুন। দর্শনী নামমাত্র।’

নিশানাথ বাবু বিজ্ঞাপন দেখে খুবই রেগে গেলেন। সফিককে গিয়ে বললেন, এম. এ. (ফলিত গণিত) এটা কোথায় পেলে? মিথ্যাচার করা হল। উফ কী তঞ্চকতা।

সফিক বলল, সবটাই তো তঞ্চকতা নিশানাথ বাবু। সবটাই যখন মিথ্যার ওপর কাজেই মিথ্যাটাকে আরেকটু বাড়ানো হল।

হাজার বৎসরের পণ্ডিতের সাধনালব্ধ জ্ঞান সবই মিথ্যা?

নিতান্ত মূঢ়ের মত কথাবার্তা। জ্ঞানহীন মুখের বাচালতা।

হিম কুন্দ মৃণালাভং দৈত্যাং পরং গুরু, সর্ব্ব শাস্ত্র প্রবক্তা ভার্গবং।

অংবং করে লাভ কিছু নাই নিশানাথ বাবু। এসব এখন ছাড়ার সময় এসে পড়েছে।

এত করেও নিশানাথ বাবুর অবস্থা ফেরানো গেল না। ঢাকা শহরের সব লোক হঠাৎ হাত দেখানো বন্ধ করে দিয়েছে কী না কে জানে। এমন খারাপ অবস্থা হবে জ্যোতির্ষাণবের স্বপ্নেও ভাবিনি। একদিন অনেক ভনিতা করে সফিককে বললেন, আমার একটা ভাল ঘড়ি আছে। এক ভক্ত দিয়েছিল। শুধু শুধু পড়ে আছে কোন কাজে লাগে না।

কাজে লাগে না কেন?

এই সব কলকব্জার ঘড়িতে কী আমাদের হয়? আমাদের দরকার বালি ঘড়ি কিংবা সূর্যঘড়ি। সেই সব ঘড়িতে পল অনুপল এই সব হিসাবও সূক্ষ্ম ভাবে করা যায়। পল বুঝা তো? পল হচ্ছে এক দণ্ডের ষাট ভাগের এক ভাগ।

সফিক নিস্পৃহ ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকে। জ্যোতির্ষিণব হাসি মুখে বলে চলেন– তাই ভাবলাম কাজে যখন লাগে না তখন আর ঘড়ি রেখে লাভ কী? রোজ চাবি দেয়া যন্ত্রণার এক শেষ। সফিক তুমি ঘড়িটা নিয়ে বিক্রি করে ফেল। সফিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায়।

বিক্রি করে ফেলব?

হ্যাঁ। সাধু সন্ন্যাসী মানুষ আমি, এই সব বিলাস সামগ্রী দুই চোখে দেখতে পারি না। তান্ত্রিক সাধনাতে মোহ মুক্তির প্রয়োজন সবচে বেশি। তোমরা এই সব বুঝবে না। বিষয়ী লোকদের বোঝা খুব মুশকিল।

জ্যোতির্ষিণব পকেট থেকে ভেলভেটের বাক্সে সযত্নে রাখা হাত ঘড়িটি বের করে টেবিলে রেখেই দ্রুত চলে গেলেন। বেশ ভাল ঘড়ি সেটি। সফিক ঘড়ির বাক্স হাতে নিয়ে গম্ভীর হয়ে বলল, ব্যাটার তো খুবই খারাপ অবস্থা রঞ্জু। ঘড়িটা তার খুব সখের। সফিক চিন্তিত মুখে ঘড়ি হাতে বেরিয়ে গেল।

জ্যোতির্ষিণবের ভাগ্য বদলাল দুপুরের একটু পর। সম্ভবত মঙ্গল হোরায় প্রবেশ করেছে, রবির ক্ষেত্র আবার ঠিকঠাক হয়ে গেছে। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম প্রকাণ্ড একটি সাদা রঙের গাড়ি এসে থামল পান্থনিবাসের সামনে। গাঢ় নীল রঙ্গের শাড়ি পরা একটি মেয়ে সেই গাড়ি থেকে নেমে সোজা উঠে এসেছে পান্থনিবাসের দোতলায়। সাধুজী নিশানাথ জ্যোতির্ষিণবের খোঁজ করছে সেই মেয়ে। আমাদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। রশীদ মিয়া পর্যন্ত একবার উঁকি দিয়ে দেখে গেল। অনেকদিন পর জ্যোতির্ষিণবের ভারী গলা পাওয়া গেল, অতি সুলক্ষণা মেয়ে মা তুমি, অতি সুলক্ষণা। চন্দ্র ও রবির মিলিত প্রভাব, কেতুর মঙ্গলে অবস্থান। এরকম হয় না, খুব কম দেখা যায়। হুঁ হুঁ। বিদ্যা ও ধান। লক্ষ্মী-স্বরস্বতী এক মালায় গাঁথা। বড় ভাগ্যবতী তুমি।

যাবার সময় সেই মেয়ে একশ টাকার দুটি নোট দিয়ে জ্যোতির্ষাণবের কণ্ঠরোধ করে দিল। নিশানাথ বাবু দুমাসের সিট রেন্ট মিটিয়ে দিলেন। সন্ধ্যাবেলা আমাকে সঙ্গে নিয়ে ধূপ কিনে আনলেন। অনেক দিন পর তাঁর ঘরে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বললো, ধূপ পুড়তে লাগল। করিম সাহেব একবার অবাক হয়ে বললেন, এককথায় দুশো টাকা দিয়ে দিল। পাগল নাকি মেয়েটা?

নিশানাথ গম্ভীর হয়ে বললেন, দুশো টাকা খুব বেশি লাগল। আপনার কাছে? হাজার টাকা নিয়েও মানুষ একদিন আমাদের সাধা সাধি করেছে। টাকা অতি তুচ্ছ জিনিস মশাই আমাদের কাছে।

অনেক দিন পর জ্যোতির্ষিণব মেসের এক তলায় সবার সঙ্গে খেতে গেলেন। মাছের তরকারীতে নুন কম হয়েছে কেন তাই নিয়ে তুমুল ঝগড়া শুরু করলেন কাদেরের সঙ্গে।

সফিক সন্ধ্যাবেলা এসে জিজ্ঞেস করল, আভাকে আসতে বলেছিলাম–এসেছিল?

আমি অবাক হয়ে বললাম, আভা কে?

ঐ যে মেয়েটির কথা বলেছিলাম, চাকরি দিয়েছিল আমাকে। আসে নাই?

এসেছিল।

বলেছিলাম আজকেই আসতে। টাকা পয়সা কত দিয়েছে জানিস নাকি? একশো টাকা দিতে বলেছিলাম।

দুশো টাকা দিয়েছে।

মেয়েটার নজর খুব উঁচু। সাধু ব্যাটা কিছু বুঝতে পারে নাই নিশ্চয়ই।

আমি কিছু বললাম না। সফিক হাসি মুখে বলল, যাক ঘড়িটি বিক্রি করতে হয় নাই। নিশানাথের খুব সখের ঘড়ি। সফিক ঘড়ি ফিরিয়ে দিতে গিয়ে প্রচণ্ড ঝগড়া বাঁধিয়ে বসল।

অতি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঝগড়া। নিশানাথ বাবু সফিককে হাসতে হাসতে বলছেন, আমার কেতু এবং মঙ্গলের যে দোষটা ছিল সেটা কেটে গেছে। সফিক। হুঁড় হুঁড় করে টাকা আসা শুরু হয়েছে। তোমার দরকার হলে বলবে লজ্জার কিছু নাই।

সফিক বলেছে, এইসব ধান্ধাবাজী এখন ছাড়েন নিশানাথ বাবু। অনেক তো করলেন।

নিশানাথ রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, পুত্রবৎ জ্ঞান করি তোমাকে আর তোমার মুখে এত বড় কথা। রাগের মাথায় ব্রহ্মশাপ দিয়ে ফেলব সফিক।

এ আমার দুর্বাশা মুণি! ব্রহ্মশাপ দেবেন।

খবরদার বলছি। জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাবে।

হাতাহাতি হয়ে যাবার মত অবস্থা।

গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে শুনি চুক চুক শব্দ হচ্ছে। অন্ধকারে বসে তিনমূর্তি চা খাচ্ছে। সফিক, জ্যোতির্ষিণব আর আমার বাবা। ফিসফিস করে তাদের কি সব কথাবার্তাও হচ্ছে। বাবা এখানেই আছেন, কিছুতেই ফিরে যেতে চাচ্ছেন না। রাত্রে জ্যোতির্ষাণবের ঘরে গিয়ে ঘুমান। দিনের বেলাটা কাটান সফিকের ঘরে। আমি দেশে ফেরানোর কথা বলে বলে হার মেনেছি। সফিক অবিশ্য বলছে, থাকুক না। তিনি। মেডিকেলে নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থাটা করি আগে।

মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ডাক্তাররা অনেক কথাবার্তা বলেও কোনো অসুখ-বিসুখ ধরতে পারলেন না। রাগী চেহারার একজন বুড়ো মত ডাক্তার শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন,

অসুবিধাটা কি আপনার বুঝতে পারছিনা তো।

বাবা বললেন, অসুবিধা তো কিছু নাই ডাক্তার সাহেব।

রাত্রে ঘুম হয়?

ঘুম হবে না কেন?

বাবা মহাসুখেই আছেন। পান্থ নিবাসের সবার সঙ্গেই তার খাতির। আজীজ সাহেব সকাল বেলা ব্যায়াম করেন। তিনি বসে থাকেন পাশে। আমাকে প্রায়ই বলেন, রঞ্জু স্বাস্থ্য হচ্ছে সমস্ত সুখের মূল। স্বাস্থ্যটা ঠিক রাখা দরকার। তুই বেলের শরবত খাবি। খুব উপকারী। আজীজ বলেছে আমাকে।

বাবার সবচেয়ে বেশি খাতির সিরাজ সাহেবের সঙ্গে। সিরাজ সাহেব কোনো এক বিচিত্র কারণে বাবাকে পছন্দ করেন। অফিস থেকে এসেই তিনি বাবাকে তার ঘরে ডেকে নিয়ে যাবেন। তারপর দরজা বন্ধ করে গুজ গুজি করে আলাপ। এক শনিবারে বাবা সিরাজ সাহেবের সঙ্গে তার গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে গেলেন। আমি কিছু বললাম না। পরের শনিবারে দেখি আবার যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছেন। আমার বিরক্তির সীমা রইল না। বাবা

শান্ত স্বরে বললেন, আমার জন্যে বৌটা কৈ মাছ জোগাড় করে রাখবে বলেছে।–না গেলে কেমন করে হয়?

কৈ মাছ খাওয়ার জন্য এত দূর যাবেন?

নারিকেলের চিড়া করে রাখবে। এখন না। যাই কী করে?

এইবার ফিরে এসে তিনি অত্যন্ত গম্ভীর মুখে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। যেন অত্যন্ত রহস্যময় একটি ব্যাপার তিনি জেনে ফেলেছেন। ব্যাপারটি দু'দিন পর আমরাও জানলাম। রাতের খাওয়ার পর বাবা আঠারো উনিশ বছরের একটি মেয়ের ছবি সফিকের টেবিলের উপর রেখে গম্ভীর হয়ে সফিকের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

সফিক অবাক হয়ে বললো, এ ছবি কার? আর এই মেয়েটিই বা কে?

বাবা রহস্যময় হাসি হেসে বললেন, রেবার ছবি।

রেবা? রেবা কে?

যেই হোক তোমার পছন্দ হয়েছে তো?

সফিক এবং আমি দুজনেই মুখ চাওয়া চাওয়ি করি। বাবা নিজেই খোলসা করেন, রেবা হচ্ছে সিরাজ সাহেবের বোন। ওর সঙ্গেই তোমার বিয়ে ঠিক করে এসেছি। পাকা কথা দিয়ে ফেলেছি।

সফিকের চেয়ে বেশি হকচাকিয়ে যাই আমি। বাবার যে কি সব লোক হাসানো কাণ্ড কারখানা।

সফিক কিন্তু সহজ ভাবেই বলে, পাকা কথা দিয়ে ফেলেছেন চাচা?

হ্যাঁ তা বলতে গেলে দিয়েই ফেলেছি। তোমার বাবা বেঁচে নাই। আমাকেই তো দেখতে হবে সব। ঠিক কিনা তুমিই বল?

তা ঠিক।

বাবা মহা উৎসাহী হয়ে ওঠেন। হাসি হাসি মুখ। তোমাকেও ওদের খুব পছন্দ। সিরাজের বৌ এখানে এসে দেখে গেছে তোমাকে। বড় ভাল মেয়ে বড় ভাল। সফিক চুপ করে থাকে। বাবা উৎসাহ এবং উত্তেজনায় ছটফট করতে থাকেন।

তোমাদের বিয়ের পর আমি কিন্তু তোমাদের বাসাতেই থাকব। রেবাকেও বললাম এই কথা।

সফিক আঁতকে উঠে বলে, তাকেও বলেছেন এই কথা?

বলব না কেন? সংসারের মাথা তো মেয়েরাই হয়। হয় না?

তা হয়।

আমার ধারণা ছিল সফিক রেগে মেগে একটা কাণ্ড করবে। বাবাকে নিয়ে আমি মহা লজ্জায় পড়ব। সে রকম কিছু হল না। সে যেন লজ্জায় পড়েই উঠে গেল সামনে থেকে।

আমি পরের সপ্তাহেই বাবাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসলাম। ঢাকায় রেখে চিকিৎসাও কিছু হচ্ছে না। শুধু শুধু টাকা নষ্ট। মা একটির পর একটি উদ্বিগ্ন চিঠি পাঠাচ্ছেন। ট্রেন ছাড়বার আগে আগে দেখি সিরাজ, সাহেব আজীজ সাহেব। আর আমাদের জ্যোতির্ষিণর এসে হাজির। তারা বিদায় জানাতে এসেছেন। আজীজ সাহেবের হাতে আবার প্রকাণ্ড একটা খাবারের ঠোঙ্গা। ট্রেন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবা ছেলে মানুষের মত ফুপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। কী যে অস্বস্তিকব অবস্থা।

৫. একশ টাকা মনি অর্ডার

মা'র নামে একশ টাকা মনি অর্ডার করে পাঠিয়ে দিলাম। আমার আর্থিক টানাটানি কিছু দূর হয়েছে। কলেজে বেতন মাফ হয়ে গিয়েছে। সন্ধ্যাবেলা একটা ভাল টিউশনি জোগাড় হয়েছে। ক্লাস নাইনের একটি মেয়েকে সপ্তাহে চার দিন পড়াই। মেয়েটি খুবই শান্ত স্বভাবের। বড়ই লাজুক। সারাক্ষণ মুখ নিচু করে পড়ে। যদি কিছু জিজ্ঞেস করি বইয়ের দিকে তাকিয়ে জবাব দেয়। মুখ তুলে তাকায় না। পড়ানো শেষ করে যখন যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াই তখন লাজুক মুখে বলে, স্যার একটু বসেন।

মেয়েটি দ্রুত চলে যায় ভেতরে; ফিরে আসে বরফ দেয়া এক গ্রাস পানি এবং ঝাক ঝাকে একটি কাচের বাটিতে কিছু খাবার নিয়ে। বিকালে আমার কিছুই খাওয়া হয় না। ক্ষিধায় নাড়ি মোচড় দিতে থাকে। লোভীর মত খাবারটা খাই। মেয়েটা নরম গলায় বলে, স্যার আরো খানিকটা আনি? আমার লজ্জা লাগে তবু অপেক্ষা করি খাবারের জন্যে। মাসের এক তারিখে মেয়েটি অতি সংকোচে টাকা দেয়। আমার হাতে। যেন স্যারকে টাকা দেয়াটা একটা লজার ব্যাপার। এত ভাল লাগে আমার। মাঝে মাঝে ছোটখাটো দু'একটা উপহার কিনে আনতে ইচ্ছা হয়। সাহস হয় না। হয়ত মেয়েটির মা কিছু মনে করবেন। মেয়ের মা কখনো আমার সামনে আসেন না। পর্দার আড়াল থেকে মাঝে মাঝে কথা বলেন, শেলী অংকে খুব কাঁচা। দেখবেন ভাল করে।

জি দেখব।

বাড়ির কাজ ঠিকমত করে না। ধমক দেবেন। আপনাকে ভাল মানুষ পেয়ে শুধু ফাঁকি দিচ্ছে বোধ হয়।

মেয়েটির বাবার সঙ্গে দেখা প্রায় হয় না বললেই হয়। তিনি সারাক্ষণ ব্যস্ত। যখন হঠাৎ এক আাধাদিন দেখা হয় তখন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন, চিনতে পারলাম না তো। কে আপনি?

আমি সংকোচে বলি, আমি শেলীর মাস্টার।

তাই তো তাই তো। আমি গত সপ্তাহেই তো দেখলাম। একটুও মনে নাই। লজ্জার ব্যাপার।

ভদ্রলোক দারুণ ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, মাস্টার সাহেবকে চা দেয়া হয়েছে? আফজাল আফজাল।

চা খেয়েছি আমি। ভূতে কী আরেকবারর খাবেন। আপনি নিজেও তো ছাত্র?

শেলী বলেছে আমাকে। একটিই টিউশনি আপনার?

আমার দারুণ লজ্জা লাগে। কান টান লাল করে বলি, বিকালেও একটা টিউশনি আছে।

আমি নিজেও খুব কষ্ট করে পড়েছি। তিন চারটা টিউশনি করতাম। একটুও ভাল লাগত না। সারাক্ষণ ভাবতাম। কখন তারা চা টা খেতে দেবে। আপনাকে চা, টা ঠিকমত দেয় তো?

হা হা করে হাসতে লাগলেন ভদ্রলোক! হাসি থামতেই গম্ভীর হয়ে বললেন, এক বাড়িতে পড়াতাম একটা ছেলেকে। মহা মুর্খ। তিনবার ফেল করেছে মেট্রিক–দেখেন অবস্থা। একেক বার ফেল করত। আর ছেলের বাবা এসে আমাকে ধমক ধামাক।–কেন ফেল করল, কেন ফেল করল।

আমার মধ্যে এক ধরনের হীনমন্যতা বোধ আছে। সব সময় নিজেকে ছোট মনে হয়। কলেজে সংকোঁচে থাকি। একেক দিন সফিকের সঙ্গে তার কাটা কাপড়ের স্তুপের কাছে যেতে হয়। টাকা পয়সা গুণে গুণে রাখতে আমার কেমন যেন লজ্জা লজ্জা করে। সব সময় মনে হয় এই বুঝি ক্লাসের কোন ছেলে বলে বসবে কে রঞ্জুনা? কিন্তু এই বাড়িতে এসে সেই ভাবটা আমার থাকে না। শেলী যেদিন জিজ্ঞেস করল, স্যার আপনি ফুটপাতে কাপড় বিক্রি করেন?

তখন কেন জানি আমার লজ্জা লাগল না। আমি খুবই সহজ ভাবেই বললাম, হ্যাঁ। আমার বন্ধুর সঙ্গে মাঝে মাঝে যাই। তুমি জানলে কী করে?

আমি হঠাৎ দেখলাম।

তোমার খারাপ লাগছিল নাকি?

না তো! মজা লেগেছে।

মেয়েটিকে দেখলেই পারুলের কথা মনে হয়। কোথায় যেন পারঙ্গলের সঙ্গে এর মিল আছে। স্পষ্ট কোনো মিল নয় এক ধরনের সূক্ষ্ম অস্পষ্ট মিল।

অনেক দিন পারুলের কোন খোজখবর জানি না। একবার শুনেছিলাম। তারা নাকি নেত্রকোনা থেকে বরিশাল চলে গেছে। নেত্রকোনায় শ্বশুর বাড়ির সঙ্গে বনিবনা হয়নি। বরিশালের ঠিকানা জানা না থাকায় চিঠিও দিতে পারি না। অনেকদিন পারুলকে দেখি না। শুধু পারুল কেন মার সঙ্গেও দেখা নাই অনেকদিন। যেতে আসতে অনেকগুলি টাকা খরচ হয়। প্রাণে ধরে এতগুলি টাকা খরচ করতে পারি না।

পান্থ নিবাসে একঘেয়ে জীবন কাটাই। সফিক সারাদিন ব্যস্ত থাকে। তার দেখা পাওয়া যায় না। অনেক রাতে ঘরে ফিরেই ঘুমুতে শুরু করে। সফিকের সেই মাস্টারিটা আর নাই। কাটা কাপড়ের ব্যবসা আবার শুরু করেছে। মনে হয় খুব একটা সুবিধা করতে পারছে না। তার স্বাস্থ্যও ভেঙে গেছে। ঘুমের মধ্যে ছটফট করে। কে জানে বড় ধরনের কোন অসুখ নিশ্চয়ই বাঁধিয়েছে। রাতের বেলা হঠাৎ জেগে উঠে বলে, শীত লাগছে রঞ্জু জানালাটা বন্ধ করা তো। ভাদ্র মাসের পঁচা গরমে তার শীত লাগে কেন কে জানে?

মাঝে মাঝে হঠাৎ সফিককে খুব খুশি খুশি লাগে। ফুর্তিবাজের ভঙ্গিতে বলে, এই বার বিয়ে করে ফেলব। দু'জন থাকলে যুদ্ধে অনেক এডভানটেজ পাওয়া যায়। অভাবের সঙ্গে কী আর একা একা ফাইট চলে?

রেবার ছবিটা বের করা হয় তখন। সফিক লাজুক স্বরে বলে, বেশ মেয়েটি, কী বলিস? ভাল মানুষের মত দেখতে।

কিন্তু রঞ্জু এই মেয়ের অনেক বুদ্ধি। দেখ চোখের দিকে তাকিয়ে।

সফিক রেবার ছবিটি যত্ন করে একটা খামে ভরে রাখে। সেই খামটি তার টিনের ট্রাঙ্কে তালাবন্ধ থাকে। সফিকেয় লজ্জা টজা একটু কম কিন্তু রেবার প্রসঙ্গ উঠলেই সে কেমন লজ্জা পায়। সে প্রসঙ্গ ওঠে। কম। আমি নিজে থেকে কখনো তুলি না। নিশানাথ বাবু অনেকবার বলেন, সিরাজ সাহেবের বোনের ব্যাপারটা নিয়ে কিছু করা দরকার। ভাল মেয়ে দেবী অংশে জন্ম। এই সব মেয়ে হাতছাড়া করা ঠিক না। বলতে বলতে আড় চোখে তাকান সফিকের দিকে। সফিক নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলে, বিয়ে নিশ্চয়ই হয়ে গেছে এতদিনে?

জিজ্ঞেস করব সিরাজ, সাহেবকে?

না না, থাক।

নিশানাথ বাবু গম্ভীর হয়ে বলেন, এই কথাটা জিজ্ঞেস করতে আর অসুবিধা কী?
সফিক চুপ করে থাকে। নিশানাথ বাবু বলেন, বড়ই বোকামী করছ সফিক। তোমার হচ্ছে স্ত্রী–ভাগ্যে উন্নতি। কথা তো শুনবে না কিছু।

নিশানাথ জ্যোতির্ষিণবের দিনকাল বড়ই খারাপ। লোকজন হাত দেখাতে আসে কালে ভদ্রে। পান্থ নিবাসের টাকা আবার বাকি পড়ে। রশীদ মিয়া রোজ সকালে টাকার জন্যে তাগাদা দিতে আসে। সরু চোখে তাকিয়ে থেকে হিসহিস করে কথা বলে, ঘর কবে ছাড়বেন বলেন দেখি? আবার তিন মাসের বাকি।

জ্যোতির্ষাণব মুখ নিচু করে থাকেন। কোন কোন দিন রশীদ মিয়ার গালাগালি চরমে ওঠে, আর এক মাস দেখব। তারপর বিসসিল্লাহ ইস্কু টাইট দিব বুঝছেন। সোজা আঙুলে না হলে আঙুল বেঁকা করা লাগে। জ্যোতির্ষার্ণব কিছুই বলেন না। নবী সাহেব মৃদু গলায় বলেন, এই সব কী বলেন রশীদ মিয়া? মানুষের অভাব হয় না। এই সব কথা বলা কী ঠিক?

ঠিক বেঠিক জানি না। আমার কথা পরিষ্কার। আমি কী দানসাগর খুলেছি নাকি? না এটা সাধুজীর বাপের হোটেল?

করিম সাহেবের সঙ্গে জ্যোতির্ষিণবের মোটেই মিল নেই। জ্যোতির্ষিণবের কোন একটা ঝামেলা হলে করিম সাহেবের আনন্দে দাঁত বের হয়ে যায়। সেই করিম সাহেবও একদিন রেগে গেলেন, এইটা কী কাণ্ড রোজ রোজ, ভদ্রলোকের অপমান।

রশীদ মিয়া চোখ লাল করে বলল, ভদ্রলোকটা কে? আমি তো কোন ভদ্রলোক দেখি না।

চুপ শালা। তোমাকে আজ আমি ভদ্রলোক গিলায়ে খাওয়াব।

রশীদ মিয়া স্তম্ভিত হয়ে গেল। শুকনা গলায় বলল, আপনে এই সব কী বলছেন করিম সাহেব?

চুপ একদম চুপ। শালা তোমার পাছায় লাথথি মেরে পাইখানার মধ্যে তোমারে কুপে ফেলব। ভদ্রলোক চিনবা তখন। হৈচৈ শুনে নিচ থেকে কাদের মিয়া ছুটে এল। নবী সাহেব

বের হয়ে আসলেন। জ্যোতির্ষিণব বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন, থামেন করিম সাহেব। কী সব বলছেন।

আপনে থামেন। আমি থামার লোক না। শালাকে খুন করে ফাঁসি যাব আমি।

করিম সাহেব লোকটিকে আমি কোনো দিনই পছন্দ করি নাই। করিম সাহেব এমন লোক, যাকে কোন কারণেই পছন্দ করা যায় না। পান্থনিবাসের কেউ তার সঙ্গে হাসি মুখে কথা বলে না। কিন্তু সেই রাতে সিরাজ সাহেব তাকে চা খাওয়াতে নিয়ে গেলেন। রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর আজীজ সাহেব তাকে তাস খেলার জন্যে ডাকতে আসলেন। নবী সাহেবের মেয়ের বাড়ি থেকে ডিমের হালুয়া এসেছিল। নবী সাহেব সেই হালুয়ার বাটি পাঠিয়ে দিলেন করিম সাহেবের ঘরে। সবাইকে ভাগ করে দেয়ার দায়িত্ব করিম সাহেবের।

৬. জ্যোতির্ষিণব ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছেন

জ্যোতির্ষিণব ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছেন।

রাত আটটায় ফিরে এসে দেখি নিশানাথ বাবুর ঘর খালি। চৌকিটা বাইরে টেনে এনে রাখা হয়েছে। রশীদ মিয়া চৌকির উপর গম্ভীর হয়ে বসে সিগারেট টানছে। কাদের বালতি বালতি পানি এনে ঘরের মেঝেতে ঢালছে এবং ঝাটা দিয়ে সশব্দে বাট দিচ্ছে। ছুটির দিন বলেই মেসে লোকজন কেউ নেই। নবী সাহেবও মেয়ের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছেন। নয়। নম্বর ঘরে যে ছেলেটি থাকে। শুধু তার ঘরে বাতি জ্বলছে। আমি অবাক হয়ে বললাম, কী ব্যাপার রশীদ সাহেব?

কিসের কী ব্যাপার?

সাধুজী কোথায়?

চলে গেছে।

কোথায় চলে গেছে?

আমি কি জানি কোথায় গেছে। আমাকে জিজ্ঞেস করেন কেন?

কখন গেছেন?

দুপুরে।

হঠাৎ চলে গেলেন যে?

কী মুশিবত আমি তার কী জানি। যেতে চাইলে আমি ধরে রাখব নাকি? শ্বশুর বাড়ি এইটা?

আমি বেশ অবাক হলাম। নিশানাথ বাবু কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ করে চলে যাবেন এটা ভাবা যায় না। তা ছাড়া তার যাওয়ার কোনো জায়গাও সম্ভবত নেই। কে জানে হয়ত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিংবা হয়ত চায়ের দোকানে বসে আছে একা একা। আমি কাপড় না ছেড়েই চায়ের দোকানে চলে গেলাম। না সেখানে সাধুজী যাননি। রাস্তার মোড়ে যে ছেলেটি পান সিগারেট বিক্রি করে সে বলল–সাধুজী সুটকেস হাতে নিয়ে উত্তর দিকে গেছেন। তার দোকান থেকে দুপ্যাকেট স্টার সিগারেট কিনেছেন।

মেসে ফিরে যেতেই নয়। নম্বরের ছেলেটির সঙ্গে দেখা হল। এই ছেলেটি এক পত্রিকার অফিসে কাজ করে। তার সব সময় নাইট ডিউটি। সারাদিন দরজা বন্ধ করে ঘুমায়, কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলে না। মেসে সে খায় না। ছুটি-ছাঁটার দিন তার কেরোসিন চুলায় নিজেই দেখি রান্না করে। আমাকে দেখেই ছেলেটি বলল, সফিক সাহেব কখন ফিরবেন?

জানি না কখন।

সফিক সাহেবের জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

কী ব্যাপার?

ছেলেটি আড় চোখে রশীদ মিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, আসেন আমার ঘরে বসি। আপনি তো আসেন নাই কখনো। আমি নিজেই অবশ্যি কাউকে বলি না। আমার একা একা থাকতে ভাল লাগে। সিঙ্গেল রুম নিয়েছি। এই জন্যে।

তার ঘর নবী সাহেবের ঘরের মতো গোছানো। দেখেই মনে হয় নারীর স্পর্শ আছে। দেয়ালে আবার নীলরঙ্গা একটি তৈলচিত্র। জ্যোৎস্না রাত্রির ছবি। অসম্ভব সুন্দর এই ছবিটি ঘরের চেহারা পাল্টে ফেলেছে। তাকালেই মন বিষণ্ন হয়।

আমার ছোট ভাইয়ের আঁকা। আর্ট কলেজে পড়ে ফোর্থ ইয়ার। আপনি কী চা খাবেন? চায়ের ব্যবস্থা আছে।

না চা খাব না। আমি, ভাত খাই নাই এখনো। আপনি কী জন্যে ডাকছিলেন।

ছেলেটি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল,

সাধুজী আজ দুপুরে আমার কাছে একটি ঘড়ি রেখে গেছেন। সফিক সাহেবকে দেয়ার জন্যে। খুব দামী ঘড়ি।

আমি চুপ করে রইলাম। ছেলেটি বলল,

তিনি যাওয়ার সময় কাদছিলেন। আমার এমন খারাপ লাগল বুঝলেন। বিকালে এক জায়গায় যাওয়ার কথা ছিল, যাই নাই দরজা বন্ধ করে বসেছিলাম।

আমি বললাম, আপনার নাম আমি জানি না। কী নাম ভাই?

সুলতান। সুলতান উদ্দিন। সাধুজী ছাড়া কেউ আমার নাম জানে না। কারো কাছে যাইনা তো। সাধুজীর কাছে একবার গিয়েছিলাম। মনটা খুব খারাপ সেই সময়। হঠাৎ গেলাম। তিনি অনেক কথা বললেন এখনো মনে আছে।

কী বললেন?

এই সান্ত্রনার কথা আর কি! অন্য রকম করে বললেন। সান্ধনার কথা বলা তো খুব কঠিন। সবাই বলতে পারে না। খুব হৃদয়বান মানুষ লাগে।

আমি অনেকক্ষণ বসে রইলাম তার ঘরে। কথাবার্তা না–চুপচাপ বসে থাকা। ছেলেটি একেবারেই কথাবার্তা বলে না যতবার বললাম, উঠি? ততবারই বলে, বসেন না। আরেকটু বসেন। সফিক সাহেব আসলে যাবেন। রাত এগারোটা পর্যন্ত সফিকের জন্যে অপেক্ষা করে খেতে গোলাম; এত রাত পর্যন্ত কাদের থাকে না। টেবিলে ভাত তরকারী ঢেকে রেখে ঘুমাতে যায়। কিন্তু আজ দেখি জেগে আছে। ভাত তরকারী বাড়তে বাড়ষ্ণুপ্রিশ্ন করে বলল, হুঁনছেন সারা করিম সার মাল খাইছে আইজ।

কী বললি?

মাথা ফট্টি নাইন। বমি কইরা ঘর ভাসাইয়া দিছে। আমারে সাফ করতে কয়। আমি কইছি মাল খাওয়া বমি আমি সাফ করি না। ভদ্রলোকের ছেলে আমি কী কন্ন স্যাব? অন্যায়। কইলাম।

উপরে উঠেই করিম সাহেবের সঙ্গে দেখা। বারান্দায় রাখা চৌকিবা উপর লম্বা হয়ে শুয়ে আছেন। আমাকে দেখেই মাথা তুলে বললেন, সাধুজী চলে গেছে শুনেছেন? শালা রশীদ মিয়ার পেটে আমি একটা তিন নম্বরী চাকু যদি না ঢুকাই তাহলে আমি বেজন্ম কুত্তা। শালার মাকে আমি...

করিম সাহেব অনর্গল কুৎসিত কথা বলতে লাগলেন। তারপর এক সময় হাড় হড় কবে বমি করে ফেললেন।

আপনার কী শরীর খারাপ করিম সাহেব?

না শরীর ঠিকই আছে। শালার সস্তার তিন অবস্থা। সস্তা জিনিস খেয়ে এখন মরণ দশা। ছয় টাকা করে বোতল বুঝলেন? বলতে বলতে আবার বমি।

সফিক আসল বারোটার দিকে। নিশানাথ বাবু চলে গেছেন এই খবরে তার কোনো ভাবান্তব হল না। ভেলভেটের বাক্সে মোড়া ঘড়ি ফেলে রাখল টেবিলের এক কোণায়। তার ভাবভঙ্গি এ রকম যেন নিশানাথ বাবুর ঘর ছেড়ে যাওয়া তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার না। বোজই এবকম হয়। রাতে ঘুমতে যাবার সময় বলল, চায়ের দোকান স্টার্ট দিয়ে দিব এইবার। খোঁজখবব শুরু করেছি। দুহাজার টাকা সেলামী দিলে শ্যামলীতে একটা ঘর পাওয়া যায়। ভাল ঘর; আভাকে বলব টাকাটা ধার দিতে।

দিবে সে?

দিবে নিশ্চয়ই। আর না দিলে কী আছে, ছোট করে শুরু করব। নবী সাহেবকে বলব কিছু দিতে।

নবী সাহেব অবশ্যি দিবেন।

সবাই দিবে। দেখিস না কী করি।

আমি বললাম, শুধু আমাদের ম্যানেজারই নেই। সফিক কোন উত্তর দিল না। বাতি নিবিয়ে মশারি ফেলে শুয়ে পড়ল। বাইবে করিম সাহেব মস মাস করে হাটতে লাগলেন। বমি টমি করলে শুনেছি মাতালদেব নেশা কেটে যায়। কিন্তু বাত যত গভীর হচ্ছে করিম সাহেবের নেশাও মনে হয় ততই গাঢ় হচ্ছে।

তিনি উঁচু গলায় বলছেন, ভয় পাওয়ার লোক না। আমি। কাউকে ভয় পাই না। লাথ দিলে সব ঠিক ঠাক। এমন লাথ ঝাড়ব পাছায় বাপের নাম ভুলিয়ে দিব।

এক সময় সফিক বিরক্ত হয়ে বলল,

ঘুমাতে যান করিম সাহেব।

কেন? তোমার হুঁকুম নাকি? আমি কী তোমার হুঁকুমের গোলাম?

চুপ করেন করিম সাহেব।

তুই চুপ কর শালা।

সফিক আর কথা বাড়াল না। আমার অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম আসল না। এপাশ ও পাশ করতে লাগলাম। বুঝতে পারছি সফিকও জেগে আছে। সফিক একবার ডাকল, জেগে আছিস নাকি রঞ্জু?

আমি জবাব দিলাম না। বাইরে করিম সাহেবেরও আর কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। সফিক এক সময় মশারির ভেতরেই একটা সিগারেট ধরিয়ে খিক খ্যক করে কাশতে লাগল। অন্ধকার ঘরে একটা লাল ফুলকি উঠানামা করছে। দেখতে দেখতে ঘুম এসে গেল।

ঘুম ভাঙলো শেষ রাত্রে। ঘরের দরজা হাট করে খোলা। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। বৃষ্টির ছাটে বিছানা ভিজে একাকার। আমি ডাকলাম, সফিক এই সফিক।

কোন উত্তর নাই। বাইরে বেরিয়ে দেখি সে সিগারেট হাতে নিয়ে বারান্দায় বসে বসে বৃষ্টিতে ভিজছে। আমাকে আসতে দেখে ক্লান্ত স্বরে বলল, ঘুম আসেছে নারে।

বৃষ্টিতে ভিজছিস তো।

সফিক একটু সরে বলল, জ্যোতির্ষাণবের জন্যে খারাপ লাগছে। বেশ খাবাপ লাগছে। সকাল হলেই খুঁজতে বের হব। ঢাকাতেই আছে নিশ্চয়ই।

সফিক খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে বলল, অনু মারা গেছে। গত পরশু চিঠি পেয়েছি। একটা টেলিগ্রাম করার দরকার মনে করে নাই।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

তুই তো আমাকে কিছু বলিস নাই সফিক।

এই সব বলতে ভাল লাগে না।

কি ভাবে মারা গেল?

সাপে কেটেছিল। তাই লেখা। ওঝা টঝা নাকি এসেছিল। আমি সফিকের হাত ধরালাম। আশ্চর্য জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। অথচ সহজ স্বাভাবিক মানুষের মত বসে আছে।

তোর তো ভয়ানক জ্বর সফিক।

হ্যাঁ শরীরটা খাবাপ।

আয় শুযে থাকবি? মাথায় জল পট্টি দেব?

নাহ এইসব কিছু লাগবে না। আমার ভালুক জ্বর; সকালবেলা থাকবে না দেখবি।

জ্যোতির্ষিণবকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

সম্ভব অসম্ভব সব জায়গায় খোজা হয়। ছিন্ন মুল মানুষেবা যে সব জায়গায় রাতে ঘুমায়, সফিক গভীর বাতে সেই সব জায়গায় খুঁজতে যায়। কমলাপুব বেল স্টেশন, লঞ্চ টার্মিনাল লাভ হয় না। কিছু। ফুটপাতে যে সব পামিস্টরা হাতেব ছবি আঁকা সাইন বোর্ড টানিয়ে

বসে থাকে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়, লম্বা চুল দাড়ির এক সাধু— হাত দেখেন, তাকে কেউ দেখেছেন? নিশানাথ নাম।

কেউ কিছু বলতে পারে না। নবী সাহেবের কথামত পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয় :

লম্বা চুল দাড়ি পরনে গেরুয়া রঙ্গের পাঞ্জাবি প্রখ্যাত জ্যোতিষ নিশানাথ জ্যোতির্ষিণবের সন্ধান প্রার্থী।

বিজ্ঞাপন ছাপার তিন দিনের দিন হন্তদন্ত হয়ে হাজির হয় আভা। আপনাদের জ্যোতিষী কোথায় গেছে?

সফিক বিরক্ত হয়ে বলে, কোথায় গেছে জানলে বিজ্ঞাপন দেই নাকি?

আমি ভাবলাম আপনাদের কোন প্াবলিসিটির ব্যাপার বুঝি।

তার পাবলিসিটি লাগে না। সে অনেক বড় দরের জ্যোতিষ।

আভা শান্ত স্বরে বলে, তিনি বড় জ্যোতিষী ছিলেন। আমার হাত দেখে জন্মবার বলে দিয়েছিলেন। আমি খুব অবাক হয়েছিলাম।

শুধু নিশানাথ নয়। নবী সাহেবও পান্থ নিবাস ছেড়ে চলে গেলেন। স্কুল থেকে মহাসমারোহে তাকে বিদায় দেয়া হয়েছে। আমরাও তার বিদায় উপলক্ষে একটু বিশেষ খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করেছিলাম। খেতে পারলেন না। মুখে নাকি কিছুই রুচছে না। খাওয়া বন্ধ করে

একবার ফিসফিস করে বললেন, আমি আর বেশিদিন বাঁচব না। পান্থ নিবাসে শিকড় গজিয়ে গেছে। বলতে বলতে তার চোখ দিয়ে পানি পরতে লাগল।

সিরাজ সাহেবের প্রমোশন হয়েছে। অফির্সাস গ্রেড পেয়েছেন। অফিস থেকে তাকে কোয়ার্টার দেয়া হয়েছে। সুন্দর কোয়ার্টার। তাঁর সঙ্গে একদিন গিয়ে দেখে আসলাম। দক্ষিণ দিকে চমৎকার বারান্দা। হুঁ হুঁ করে হাওয়া বয়। সিরাজ সাহেবও পান্থনিবাস ছেড়ে চলে গেলেন। যাবার আগের দিন রাতে বিদায় নিতে এলেন আমাদের কাছ থেকে। কথা সরে না। তাঁর মুখে। অনেকক্ষণ বসে রইলেন চুপ চাপ। এক সময় বললেন, সুখেই ছিলাম ভাই আপনাদের সাথে। আনন্দেই ছিলাম। নিশানাথ বাবুর খালি ঘরটা দেখলে চোখে পানি আসে। আমার স্ত্রীকে তিনি বড় স্নেহ করতেন।

সত্যি সত্যি চোখে পানি ছলছলিয়ে উঠল। সফিক শুয়ে ছিল। সফিকের মাথায় হাত রেখে বললেন, জ্বর কী আবার এসেছে?

আছে অল্প।

অবহেলা করবেন না ভাই। ভাল ডাক্তার দেখাবেন।

ক্ষণিকক্ষণ চুপ থেকে আমতা আমতা করে বললেন, আমি অতি দরিদ্র মানুষ তবু যদি কখনো কোন প্রয়োজন হয়...

সফিক কথার মাঝখানে আমাচকা জিজ্ঞেস করল, আপনার ছোট বোন রেবা, তার কী বিয়ে হয়েছে?

হ্যাঁ গত বৈশাখ মাসে বিয়ে দিয়েছি। ঢাকাতেই থাকে। ভাল বিয়ে হয়েছে। ছেলেটা অতি ভাল। আমি ভাবি নাই এত ভাল বিয়ে দিতে পারব।

সফিক আর কিছু বলল না। সিরাজ সাহেব বললেন, আপনারা দু'জন একদিন গিয়ে যদি দেখে আসেন সে খুব খুশি হবে। আপনাদেবকে চিনে খুব। সেই দিনও জিজ্ঞেস করল। আপনার অসুখের কথা।

নতুন কোন বোর্ডার এল না পান্থনিবাসে। শুনেছি। রশীদ মিয়া মেস ভেঙে বাড়ি বানিয়ে ভাড়া দেবেন। মেসে নাকি তেমন আয় হয় না। এর মধ্যে মার চিঠি পেলাম :

তোমার পাঠানো একশত টাকা পাইয়াছি। আমি শুনিয়া মর্মাহত হইলাম যে তুমি পড়াশুনা ছাড়িয়া কাপড় ফেরি করিয়া বেড়াও। তোমার দুই মামা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন। তোমাব মনে রাখা উচিত তোমার নানা অত্যন্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তুমি ছোটলোকের মত ফেরিওয়ালা হইয়াছ এই দুঃখ আমি কোথায় রাখি। পারুলের মত তুমিও যে বংশের মান ডুবাইবে তাহা ভাবি নাই। দোয়া জানিও। অতি অবশ্য একবার আসিবে। তোমার বাবার একটি পা অচল। হাঁটা চলা করিতে পারে না...

চিঠি পড়ে আমি দীর্ঘ সময় চুপচাপ বসে থাকি। গলা ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হয়।

৭. আজকাল বড় অস্থির লাগে

আজকাল বড় অস্থির লাগে।

সব যেন অগোছালো হয়ে গেছে। সুর কেটে গেছে। সফিকেব। সেই হাসি খুশি ভাব নেই। তার জ্বর কখনো থাকে কখনো থাকে না। মেডিকেল কলেজ থেকে এক্সরে করিয়ে এসেছে যক্ষ্মাপক্ষ্মা কিছু নেই। তার ব্যবসা খুব মন্দা যাচ্ছে। কিন্তু কেমন করে যেন প্রেসের পুরনো চাকরিটা আবার জোগাড় করেছে। আজকাল সে কৃপণের মত টাকা জমায়। তার খরচপাতি এমনিতেই অবশ্যি কমে গেছে। বোনকে টাকা পাঠাতে হয় না। আদর করে একটি পয়সাও খরচ করে না। মেডিকেল কলেজের ছোকড়া ডাক্তারটি বার বার বলেছিল, ভাল ভাল খাবার খাবেন। দুধ টুধ নিয়মিত খাবেন। আপনার এখন হাই প্রোটিন ডায়েট দরকার। ডাক্তারের কথা সে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে।

হাই প্রোটিন ডায়েট খাব পয়সা কোথায়? পাস বুকের পাই পয়সাও খরচ করব না।

সেই একটি সাইন বোর্ড লিখিয়ে এনেছে—'নীলগঞ্জ হোটেল এ্যান্ড রেস্টুরেন্ট'

প্রকাণ্ড সাইন বোর্ড। খবরের কাগজে মুড়ে সেই সাইন বোর্ডটি রাখা হয়েছে চৌকির নিচে। মাঝে মাঝে রাত জেগে সে টাকা পয়সার হিসাব মিলায়। হাসি মুখে বলে, দেরি নাই আর। শুরু করে দিতে হবে।

তার চোখ জ্বল জুলি করে। গম্ভীর হয়ে বলে, ছোট থেকে শুরু হবে। প্রথমে থাকবে সাদামাটা চায়ের দোকান। তার পর বড় একটা হোটেল দেব। একটা হুঁলস্থূল কাণ্ড করব দেখবি।

সেই হুঁলস্থূল কাণ্ড করবার জন্যে সে প্রায়ই না খেয়ে থাকে।

একদিন বলল, চায়ের চিনি দেবার দবকার কী? চীনারা বিনা চিনিতে দিব্যি চা খাচ্ছে। না চিনিটা আমি উঠিয়েই দেব, অনেকগুলি টাকা বাঁচে বুঝলি?

পান্থ নিবাসের নাম ফলক রশীদ মিয়া সরিয়ে ফেলেছে। তিন তলায় নতুন নতুন ঘর উঠছে। জানালায় নতুন শিক বসানো হচ্ছে। চুনকাম হচ্ছে। একদিন দেখি রোকেয়া ভিলা নামে একটা সাইন বোর্ড শোভা পাচ্ছে। আমাদের কাছে নোটিশ দিয়েছে, দুই মাসের ভেতর বাড়ি খালি করে দিতে হবে। অন্যথায় আইনের আশ্রয় নেয়া হবে এই জাতীয় কথা লেখা।

করিম সাহেব এই নিয়ে খুব হৈচৈ কবছেন, উঠিয়ে দিবে বললেই হল? হাইকোর্টে কেইস করে শালার পাতলা পায়খানা বের করে দিব না? উঠিয়ে দেয়া খেলা কথা না। হুঁ হুঁ।

করিম সাহেব আজকাল প্রায় রাতেই মদটদ্দ খেয়ে এসে বিশ্রী সব কাণ্ড কারখানা করেন। কেউ কিছু বললেই আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করেন, নিজের পয়সায় খাই। কারোর বাপের পয়সায় না। কারোর সাহস থাকে বলুক দেখি মুখের সামনে। জুতিয়ে দাঁত খুলে ফেলব না? ভদ্রলোক চিনা আছে আমার।

সত্য মিথ্যা জানি না, শুনছি। অফিসে কী একটা টাকা পয়সার গণ্ডগোলেব জন্য করিম সাহেবকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। তদন্ত-টদন্ত হচ্ছে। কথাটা সত্যি হতেও পারে। কয়েক দিন ধরে দেখছি অফিসে যান না। গতকাল আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, কী ব্যাপার করিম সাহেব অফিসে যান না। দেখি!

করিম সাহেব রেগে আগুন।

যাই না যাই সেটা আমার ব্যাপার। আপনে কোথাকার কে? আপনার খাই? না আপনার পরি? বি.এ. পরীক্ষার ফিস জমা দিয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছি। নবী সাহেবের ঘরটিতে এখন একা একা থাকি। দিনরাত পড়তে চেষ্টা করি। নীরস পাঠ্য বইয়ের স্তুপ একেক সময় অসহ্য বোধ হয়। কোথায়ও হাফ ছাড়বার জন্যে যেতে ইচ্ছে হয়। যাওয়ার জায়গা নেই কোনো। আমার ছাত্রীটির বাসায় যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু বিনা দরকারে শুধু শুধু যাওয়া। শেলীর বাবা-মা কেউ কিছু মনে করেন কী না তাই ভেবে যাওয়া হয় না।

মাকে দেখতে গিয়েছিলাম। এর মধ্যে। মা আগের মতই আছেন। এতদিন ধারণা ছিল বোধহয় খুব কষ্টে আছেন। কিন্তু দেখা গেল অবস্থা মোটেই সে রকম নয়। বাড়ির পেছনে সজী বাগান করেছেন। হাঁস-মুরগী পালছেন। ধান-চাল রাখার জন্য নতুন একটি ঘর তোলা হয়েছে। এমন অবাক লাগল দেখে! বাবার প্যারালিসিসও তেমন কিছু নয়। দেয়াল ধবে বেশ দাঁড়াতে পারেন।

অঞ্জু দেখলাম অনেক বড় হয়েছে। তাকে অতি কড়া শাসনে রাখা হয়। অঞ্জর কাছেই শুনলাম সে ঘুমিয়ে পড়লে মা তার বই খাতা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেন। যেন পারুলের মত কিছু আবার না ঘটে। অঞ্জু অনেক চালাক চতুর হয়েছে। অনেক কথা বলল সে। গল্প বলাও বেশ শিখেছে।

পারুল আপা ভালই করেছে দাদা। কী যে দিন গেছে আমাদের। কতদিন শুধু একবেলা রান্না হয়েছে। মার মেজাজ তো জানাই। সব সময় আগুনের মত তেঁতে থাকতেন। একদিন কী করেছেন শোন–বাবা দেরি করে ফিরেছেন। এগারোটার মত বাজে প্রায়। মা দরজা খুললেন না কিছুতেই।

খুললেন না কেন?

কে জানে কেন? কে যাবে জিজ্ঞেস করতে?

অঞ্জু এক ফাঁকে আমাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি নাকি দাদা বাড়ি বাড়ি কাপড় ফেরি করে বেড়াও? কত কাণ্ড হল এই নিয়ে। মামারা রেগে আগুন। বাবা বেচারা সরল মানুষ। ছোট মামাকে বলেছেন, তুমি নিজেও তো মানুষের বাড়ি গিয়ে রোগী দেখ। তাতে দোষ হয় না?

অঞ্জু হাসতে লাগল খিলখিল করে। বহু কষ্টে হাসি থামিয়ে বলল, ছোট মামা তখন একেবারে হাউইয়ের মত নাচতে লাগলেন। মার সঙ্গে তুমুল ঝগড়া হল তখন। মায়ের সঙ্গে ঝগড়ায় কে পারবে বল? ছোট মামা হেরে ভূত।

মার সঙ্গে ঝগড়া কী নিয়ে?

জমি নিয়ে। নানার সম্পত্তির ওয়ারিশান চাইলেন মা। তাতেই লেগে গেল।

ওয়ারিশান পেয়েছেন?

পাবেন না মানে? মাকে তুমি এখনো চেন নাই দাদা।

অঞ্জুর কাছে শুনলাম মা আজকাল কারো সঙ্গে কথাবার্তা বিশেষ বলেন না। আমার সঙ্গেও বললেন না। অভাবে অনটনে এরকম হয় নাকি মানুষ? আবেগ শূন্য কথাবার্তা। সেই চরম অভাব এখন তো আর নেই। এখন এরকম হবে কেন? বাবার ধারণা মায়ের সঙ্গে জীন থাকে। আমাকে একবার একা পেয়ে ফিসফিস করে বললেন, সব জীনের কাণ্ড কারখানা।

কিসের কাণ্ড কারখানা?

জীনের। তোর মাকে জীন ধরেছে।

কী যে বলেন। আপনি!

বাবার পাগলামী মনে হল সেরে গেছে। সহজ স্বাভাবিক কথাবার্তা। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবার কথা জিজ্ঞেস করলেন,

সফিক কেমন আছে? রেবাকে বিয়ে করেছে নাকি? আহা কেন করল না। নিশানাথ কই? সন্ন্যাসী হয়ে গেছে? আহারে বড় ভাল মানুষ ছিল! সন্ন্যাসী তো হবেই। ভালো মানুষ সংসারে থাকতে পারে?

অঞ্জকে জিজ্ঞেস করলাম, বাবার বেহালাব সখা মিটে গেছে নাকি রে?

অঞ্জু লাফিয়ে উঠল, সবচে দারুণ খবরটা তোমাকে দেয়া হয়নি দাদা। বাবা চমৎকার বেহালা বাজায়। যা চমৎকার! যা চমৎকার!

সে কী?

হ্যাঁ দাদা, তুমি বিশ্বাস করবে না। কী চমৎকার! মা পর্যন্ত হতভম্ভ হয়ে তাকিয়ে থাকেন।

বেহালা কিনেছেন নাকি বাবা?

না হারু-গায়েনকে খবর দিলেই সে বেহালা দিয়ে যায়। তুমি আজ বল বাবাকে বাজাতে। সন্ধ্যার পর সবাই গোল হয়ে বসব। বেশ হবে দাদা। বলবে তো?

বাবাকে বেহালা বাজানোর কথা বলতেই তিনি আঁৎকে উঠলেন, পূর্ণিমা আজকে। পূর্ণিমার সময় বেহালা বাজালে পরী নামে এটাও জানিস না, গাধা নাকি? পরীক্ষণেই গলার স্বর নামিয়ে বললেন, তুই তো বিশ্বাস করলি না। যখন বললাম তোর মার সঙ্গে জীন আছে। জীন আছে বলেই তো যখন বাজাই তখন এমন করে তাকায় আমার দিকে–ভয়ে আমার বুক কাঁপে। এই দেখ হাতের লোম খাড়া হয়ে গেছে।

ঢাকায় ফিরে আসার দিন মা আমাকে একশ টাকার একটি নোট দিয়ে বললেন, তুমি যে টাকা পাঠিয়েছিলে সেই টাকা; সাথে নিয়ে যাও; ফেরিওয়ালা হবার দরকার নেই। যখন টাকার দরকার হবে লিখবো।

আমার চোখে পানি এসে গেল। মা এরকম হয়ে গেলেন কী করে? দু'দিন ছিলাম। এর মধ্যে একবার মাত্র তিনি আগের মত সহজ স্বাভাবিক ভাবে কথা বললেন। আগের মত নরম স্বরের মিষ্টি কথা, তোর বাবার বেহালা শুনে যা। মানুষের মধ্যে যে কী গুণ আছে তা বোঝা বড় কষ্ট। এখন বড় আফসোস হয়। কে জানে তাঁর এই আফসোস কী জন্যে?

বাবার কাছে যখন বিদায় নিতে গেলাম। তিনি যেন কেমন কেমন ভঙ্গিতে তাকালেন। যেন আমাকে চিনতে পারছেন না। খানিকক্ষণ পর গম্ভীর হয়ে বললেন, চলে যাবেন যে চা, টা খেয়েছেন? চা না খেয়ে যাবেন না যেন। অঞ্জু খিলখিল করে হাসতে হাসতে বলল, আপনি আপনি করছে কেন বাবা?

চিনতে পারছ না?

বাবা রাগী গলায় বললেন, হাসিস না। শুধু শুধু, চিনিব না কেন? না চেনার কী আছে?

বাবা ঘোর লাগা চোখে তাকালেন। আমার বুকের মধ্যে ধক করে উঠল। সত্যি তাহলে আমাকে চিনতে পারছেন না। অঞ্জু বলল, তুমি মনে হয় ঘাবড়ে গেছ দাদা। মাঝে মাঝে বাবার এরকম হয়। কাউকে চিনতে পারেন না। আবার ঠিক হয়ে যায়।

ঢাকায় এসে দুটি চিঠি পেলাম। একটি পারুলোব। পারুলের চিঠিতে একটা দারুণ মজার খবর আছে। তার জমজ মেয়ে হয়েছে। পারুলের সব কাণ্ড কারখানাই অদ্ভুত। দ্বিতীয় চিঠিটি লিখেছে শেলী। তিন লাইনের চিঠি।

পরম শ্রদ্ধেয় স্যার,

আমার সালাম জানবেন। মা আপনাকে চিঠি লিখতে বললেন। আপনি তার সঙ্গে দেখা করবেন। আপনি আর আসেন না কেন?

বিনীতা

শেলী

৮. এত বড় বাড়ি খাঁ খাঁ করছে

এত বড় বাড়ি খাঁ খাঁ করছে।

কেউ কোথাও নেই। গেটের পাশে দারোয়ান দাঁড়িয়ে থাকত আজ সেও নেই। দরজার সামনে ভারী পর্দা দুলছে। পর্দা টেনে ভেতরে ঢুকতে সংকোচ লাগলো। কে জানে হয়তো শেলীর মা ভেতরে বসে আছেন। তিনি কখনো আসেন না। আমার সামনে। হয়ত বিরক্ত হবেন। হয়ত লজ্জা পাবেন।

বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলাম। এগারোটা বাজাব ঘণ্টা দিচ্ছে। এদের বসবার ঘরে অদ্ভুত একটা দেয়াল ঘড়ি আছে। বাজনার মত শব্দে ঘণ্টা বাজে।

কাকে চান?

আমি চমকে দেখি চশমা পড়া একজন মহিলা পর্দা সরিয়ে উঁকি দিচ্ছেন। আমি ইতস্তত করতে লাগলাম; কে জানে ইনিই হয়তো শেলীর মা। থেমে থেমে বললাম, আমি শেলীর মাস্টার।

হ্যাঁ আমি চিনতে পারছি। কী ব্যাপার?

আমাকে আসতে বলেছিলেন।

কে আসতে বলেছিলেন?

শেলীর মা আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন।

ভদ্রমহিলার ভ্রূ কুঞ্চিত হল। অবাক হয়ে তাকালেন।

আমি, আমি খবর দিয়েছিলাম? কেন, আমি খবর দেব কেন? ঘাম বেরিয়ে গেল আমার। পিপাসা বোধ হল। শেলীর মা শান্ত স্বরে বললেন, ঘরে এসে বসুন। কেউ নেই আজকে। শেলী তার ফুপার বাসায় গেছে। ফিরতে রাত হবে। আচ্ছা খবর দিয়েছে কে?

আমি ঘামতে ঘামতে বললাম, তাহলে হয়ত ভুল হয়েছে আমার। আচ্ছা আমি তাহলে যাই।

না না চা খেয়ে যাবেন। চা দিতে বলছি। খবর কে দিয়েছে আপনাকে?

আমি শুকনো গলায় বললাম, শেলী চিঠি দিয়েছিল।

ও তাই। আছে চিঠিটা? দেখি একটু।

শেলীর মা ভ্রূ কুঁচকে সে চিঠি পড়লেন। বন্ধ করে খামে ভরলেন আবার খুলে পড়লেন। আমার মনে হল তাঁর ঠোঁটের কোণায় একটু যেন হাসির আভাস।

চা আসতে দেরি হল না। চায়ের সঙ্গে দুটি সন্দেশ। ঝাক ঝাঁকে রুপোর গ্লাসে বরফ মেশানো ঠাণ্ডা পানি। ভদ্রমহিলা খুব কৌতূহলী হয়ে আমার দিকে বারবার তাকাচ্ছেন। এক সময় যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এই ভঙ্গিতে বললেন, হ্যাঁ একবার অবিশ্য বলেছিলাম শেলীকে তোমাকে এখানে আসবার কথা লিখতে! তেমন কোনো কারণে নয়।

আমি কোনো কথা বলতে পারলাম না। ভদ্রমহিলা বললেন, বয়সে অনেক ছোট তুমি। তুমি করে বলছি বলে আবার রাগ করছ না তো?

জি না।

তুমি আজ রাতে ন'টার দিকে একবার আসবে? শেলীর বাবা বাসায় থাকবেন তখন। আসতে পারবে?

যদি বলেন আসতে আসব।

হ্যাঁ। আসবে তুমি। আমি বরংচ গাড়ি পাঠাব।

গাড়ি পাঠাতে হবে না। আমি আসব।

আর শোন, শেলীর চিঠিটা থাকুক আমার কাছে।

সমস্ত দিন কাটল এক ধরনের আতঙ্কের মধ্যে। একি কাণ্ড করল শেলী? কেন করল? বোধহয় কিছু না ভেবেই করেছে। সারা দুপুর শুয়ে রইলাম। কিছুই ভাল লাগছে না। প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। এর মধ্যে করিম সাহেব এসে খ্যান খ্যান শুরু করেছেন। তার বক্তব্য – সফিক কোন সাহসে তাকে চায়ের দোকানে যোগ দিতে বলল। চাকুরি নাই বলেই রিকশাওয়ালাদের জন্যে চা বানাতে হবে? সফিক ভেবেছেটা কী? মান-সম্মান বলে একটা জিনিস আছে ইত্যাদি। আমার বিরক্তির সীমা রইল না। করিম সাহেব বক বক করতেই

লাগলেন, আমার দাদার বাবা ছিলেন জমিদার বুঝলেন? তিনটা হাতী ছিল আমাদের। জুতা হাতে নিয়ে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে কেউ হাঁটতে পারত না। জুতা বগলে নিতে হত। আমাদের বসত বাড়ির ইট বিক্রি করলেও লাখ দুই লাখ টাকা হয় বুঝলেন?

সফিক আসলো সন্ধ্যাবেলা। অতিব্যস্ত সে। এসেই এক ধমক লাগাল, সন্ধ্যাবেলা শুয়ে আছিস। কাপড় পর। নীলগঞ্জ হোটেল এ্যান্ড রেস্টুরেন্ট দেখিয়ে আনি।

আরেক দিন দেখব। আজ কাজ আছে এক জায়গায়। নটার সময় যেতে হবে।

নটা বাজতে দেরি আছে। উঠ দেখি। করিম সাহেব। আপনিও চলেন দেখি। সবাই মিলে রেস্টুরেন্টটা দাঁড় করিয়ে দেই।

করিম সাহেব মুখ লম্বা করে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

সফিক হাসি মুখে বলল, ঘর ভাড়া নিয়ে নিয়েছি। সাইন বোর্ড। আজ সকালে টাঙ্গিয়ে দিয়ে আসলাম। জিনিসপত্তর কেনাকাটা বাকি আছে। লালুকে সাথে নিয়ে সেই সব কিনব, এক্সপার্ট আদমি সে।

সফিকের উৎসাহের সীমা নেই। আমি শুনছি কী শুনছি না। সেই দিকেও খেয়াল নেই। নিজের মনেই কথা বলে যাচ্ছে, ঘরের মধ্যে পার্টিসন দিয়ে থাকার জায়গা করেছি। দিব্যি পড়াশুনা করতে পারবি তুই। ইলেকট্রিসিটি আছে, অসুবিধা কিছু নাই। তুই আর করিম সাহেব তোরা দুইজন কাল পরশুর মধ্যে চলে আয়।

করিম সাহেব?

হ্যাঁ ও আর যাবে কোথায়? পঞ্চাশ বৎসর বয়সে কী আর নতুন করে চাকরি করা যায়? দুই একদিন গাই গুই করবে তারপর দেখবি ঠিকই লেগে পড়েছে হা হা হা।

ঘরের সামনে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। নড়বড়ে একটা ঘর কোনো মতে দাঁড়িয়ে আছে।

এই তোর ঘর?

তুই কী ভেবেছিলি? একটা সাত মহল রাজপ্রাসাদ?

কে আসবে তোর এখানে চা খেতে?

আসবে না কেন সেইটা শুনি আগে?

একটা ছেলে এসে ঘরের তালা খুলে দিল। সফিক হৃষ্ট চিত্তে বলল, এর নাম কালু। দারুণ কাজের ছেলে।

কি রে ব্যাটা আছিস কেমন?

বালা আছি স্যার।

আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম সব। সারি সারি বেঞ্চ পাতা। ফাঁকে ফাঁকে আবার টুল কাঠের চেয়ার। মেঝেতে ইদুর কিংবা সাপের গর্ত। দরমার বেড়ায় এক চিলতে জায়গা আবার আলাদা করা। তার মধ্যে গাদাগাদি করে রাখা দুটি জরাজীর্ণ চৌকি।

সফিক বলল, কি রে পছন্দ হয়েছে?

আমি ক্ষীণ স্বরে বললাম, ভালই তো।

বুঝতে পারছি তোর পছন্দ হয়নি। দেখবি সব হবে। আমি না খেয়ে দিন কাটিয়েছি। রাস্তায় রাস্তায় সুচ পর্যন্ত বিক্রি করেছি। আমি, কী ভেবেছিস ছেড়ে দিব? আয় চা খাই।

কোথায় চা খাবি?

পাশেই চায়ের দোকান আছে একটা।

চায়ের দোকানের মালিক সফিককে দেখে। গম্ভীর হয়ে গেল।

সফিক হাসিমুখে বলল,

ভাল আছেন নাকি রহমান সাব?

ভাল আর কেমনে থাকুম কন। আমার দোকানের পিছে দোকান দিছেন, ভাল থাকন যায়?

এই তো ভালরে ভাই কম্পিটিশন হবে। যেটা ভাল সেটা টিকবে।

সফিক ঘর কাঁপিয়ে হাসতে লাগল। হাসি থামিয়ে বলল, রহমান সাব সব বি. এ. এম. এ পাস ছেলেরা কাজ করবে আমার দোকানে। এই দেখেন একজন বি. এ.পাস।

রহমান সাহেব সরু চোখে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। সফিক গম্ভীর হয়ে বলল, আর আমাদের ম্যানেজার কে জানেন নাকি? নিশানাথ জ্যোতির্ষিণব। জ্যোতিষ সাগর। বুঝেন কাণ্ড ইয়া দাড়িইয়া গোফ।

রহমান সাহেব নিস্পৃহ সুরে বললেন, ভদ্রলোক আপনেরা সাবধানে থাকবেন। পাড়াটা গুপ্ত বদমাইশের পাড়া। আমি থাকতে পারি না। আর আপনেরা নতুন মানুষ।

গুণ্ডা বদমাইশ কী করবে আমাদের? আমাদের ম্যানেজার সাক্ষাত দুর্বাষা মুণি। কাঁচা গিলে ফেলবে।

কাঁচা গিললে তো ভালই। আপনেরা চা খাইবেন? এই চা দে দেখি।

রহমান সাহেব গম্ভীর হয়ে বিড়ি ধরালেন। সফিক ফিসফিস করে বলল, ব্যাটা তখন থেকেই ভয় দেখাচ্ছে শুধু। একবার মিনো গুণ্ডাকে নিয়ে আসব। মিনো গুণ্ডাকে দেখলে রহমান সাহেবের দিল ঠাণ্ডা হয়ে যাবে দেখিস।

মিনোটা কে?

আছে আছে। আমার কাছেও জিনিসপত্র আছে। হা হা হা। মিনো গুণ্ডা আমার ছাত্র ছিল।

পান্থনিবাসে ফিরলাম রাত আটটার দিকে। বাড়ির সামনের জায়গাটা অন্ধকার। সেই অন্ধকারে ঘাপটি মেরে কে যেন বসে আছে। সফিক কড়া গলায় বলল, কে ওখানে কে?

কোনো সাড়া শব্দ নেই। আরেকটু এগিয়ে যেতেই বুকের মধ্যে কী ধরনের যেন অনুভূতি হল। দুজনেই থমকে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে চেঁচালাম, কে কে?

আমি নিশানাথ।

আমরা অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলাম না। জগতে কত অদ্ভুত ঘটনাই না ঘটে। সফিক প্রথম বলল, ভাবলেশহীন গলা, এইখানে কী মনে করে নিশানাথ বাবু? কিছু ফেলে গিয়েছিলেন নাকি?

নিশানাথ বাবু শান্ত গলায় বললেন, তুমি ভাল সফিক?

আমি কেমন আছি তা দিয়ে আপনার কোন দরকার নিশানাথ বাবু? আমি দৌড়ে গিয়ে নিশানাথ বাবুর হাত ধরে ফেললাম। গাঢ় স্বরে বললাম, আসেন। ঘরে আসেন।

প্রায় দুমাস পর দেখছি জ্যোতির্ষিণবকে। গেরুয়া পাঞ্জাবি ছাড়া সব কিছু আগের মতই আছে। পাঞ্জাবির বদলে সাদা রঙের একটি শার্ট। বেশ খানিকটা রোগ লাগছে। চোখ দুটি যেন অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। নাকি আমার দেখার ভুল।

সফিক এমন একটা ভাব করতে লাগল যেন জ্যোতির্ষাণবের ফিরে আসাটা তেমন কোন ব্যাপার নয়। সাধুজী যেন চা খেতে গিয়েছিল। চা খেয়ে ফিরে এসেছে। সে গুন গুন করে

কী একটা গানের কলি ভাজিল। তারপর গভীর মনোযোগের সঙ্গে হিসাবপত্রের খাতা বের করে কী যেন দেখতে লাগল। এমন সব ছেলেমানুষী কাণ্ড সফিকের। শেষ পর্যন্ত আমার অসহ্য বোধ হল। চেঁচিয়ে বললাম, বন্ধ করা তো খাতাটা।

সফিক খাতা বন্ধ করে গম্ভীর স্বরে বলল, নিশানাথ জ্যোতির্ষিণব, আপনাকে আমাদের ম্যানেজার করা হয়েছে।

কিসের ম্যানেজার?

চায়ের দোকান দিয়েছি আমরা।

জ্যোতির্ষিণবের ঠোঁটের কোণায় হাসি খেলে গেল। হালকা গলায় বললেন, সত্যি সত্যি শেষ পর্যন্ত রেস্টুরেন্ট দিয়েছ?

হ্যাঁ ঘর ভাড়া হয়ে গেছে।

ঘর ভাড়া হয়ে গেছে।

হুঁ।

জ্যোতির্ষিণব হাসি মুখে তাকিয়ে রইলেন। অনেকক্ষণ আর কেউ কোন কথা বলল না। সফিক মৃদু স্বরে বলল, নৈশব্দের পরী উড়ে গেছে তাই না নিশানাথ বাবু? হঠাৎ সবাই চুপ করলে পরী উড়ে যায়। তাই না?

জ্যোতির্ষিণব মৃদু স্বরে বললেন, তোমার অসুখটা সেড়েছে সফিক?

হ্যাঁ সেরেছে।

জ্বর আসেনা আর?

আর কোনোদিন আসবে না।

আমি বললাম, আপনি কোথায় ছিলেন এতদিন?

জায়গায় জায়গায় ঘুরে বেড়ালাম।

খেতেন কী?

আশ্চর্যের কথা কী জান? খাওয়া জুটে গেছে। না খেয়ে থাকিনি কখনো। পান্থ নিবাসে বরং আমার কষ্ট হয়েছে বেশি।

সফিক দৃঢ় স্বরে বলল, আর কষ্ট হবে না। আর কখনো না খেয়ে থাকতে হবে না। দেখবেন দিনকাল পাল্টে ফেলব।

নিশানাথ বাবু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। যেন সফিকের কথাটি ঠিক নয়। সফিক ভুল বলছে। আমি বললাম, আমাদের কিছু না বলে চলে গেলেন কেন?

খুব মায়ায় জড়িয়ে পড়েছিলাম। মায়া কাটানোর জন্যেই এটা করেছি।

সফিক কড়া গলায় বলল, মায়া কেটেছে?

নিশানাথ বাবু থেমে বললেন, মায়া কাটছে সফিক।

তাহলে ফিরে আসলেন কেন?

জ্যোতির্ষিণব তার জবাব না দিয়ে রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসতে লাগলেন। যেন খুব একটি ছেলেমানুষী প্রশ্ন তাকে করা হয়েছে। কিন্তু নটা বেজে যাচ্ছে। আমি আর থাকতে পারি না। আমি উঠে দাঁড়ালাম, এক ঘণ্টার মধ্যে আমি আসব। একটা খুব জরুরি কাজ আছে না গেলেই নয়।

জ্যোতির্ষিণব আমার দিকে তাকিয়ে রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসতে লাগলেন।

আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন তাঁরা।

শেলীর বাবা বললেন, তোমার দেরি দেখে ভাবলাম হয়তো আসবে না। গাড়ি পাঠাব। কিনা তাই ভূড়ামু, শেলীর মা কোণার দিকে একটি সোফায় বসেছিলেন, তিনি গলা উঁচিয়ে ডাকলেন, শেলী শেলী।

শেলী এসে দাঁড়াল পর্দার ও পাশে। হয়ত সে এখানে আসতে লজ্জা পাচ্ছে। সে প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলল, কী জন্যে ডাকছ মা।

ভেতরে আস। বাইরে দাঁড়িয়ে কেন?

বল না। কী জন্য ডাকছ?

তোমার স্যারকে চা দাও।

শেলীর বাবা বিরক্ত হয়ে বললেন, দুপুর রাতে চা কেন? টেবিলে খাবার দিতে বল। তুমি নিশ্চয়ই খেয়ে আসনি? আর খেয়ে এসে থাকলেও বস।

খাবার টেবিলে অনেক কথা বললেন ভদ্রলোক। কত কষ্ট করে পড়াশুনা করেছেন। মানুষের বাড়িতে আশ্রিত হিসেবে থাকতেন। সেই সব কথা বলছেন গর্ব এবং অহংকারের সঙ্গে। একজন সফল মানুষের মুখে তার দুর্ভাগ্যের দিনের কথা শুনতে ভালই লাগে। শেলীর মা একবার শুধু বললেন, এই সব কথা ছাড়া তোমার অন্য গল্প নাই?

ভদ্রলোক হা হা করে হাসতে লাগলেন। যেন মজার একটি কথা বলা হয়েছে। শেলী একটি কথাও বলল না একবার ফিরেও তাকাল না আমার দিকে। একটি গাঢ় নীল রঙ্গের শাড়িতে তাকে জলপরীর মত লাগছিল। শাড়িতে কখনো দেখিনি তাকে! এ যেন অন্য একটি মেয়ে। শেলীর মা খেতে খেতেই জিজ্ঞেস করছিলেন, ক ভাই বোন আমরা। কী তাদের নাম। কী করছে। পান্থ নিবাসে থেকে পড়াশুনা করতে নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হয়। পড়াশুনা শেষ করে কী করব?

খাওয়া শেষ হতেই আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, আমি কী এখন যাব?

ভদ্রলোক আবার হা হা করে হেসে উঠলেন। যেন এই কথাটিও অত্যন্ত মজার। বহু কষ্টে হাসি থামিয়ে বললেন, নিশ্চয়ই যাবে। তবে তুমি একটা কাজ কর আমার এখানে অনেক খালি ঘর পড়ে আছে। তুমি আমার এখানে এসে থাক।

শেলীর মা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আমিও তাই ভাবছিলাম। তুমি চলে আস এখানে পড়াশুনার তোমার খুব সুবিধা হবে। তা ছাড়া শেলী বেচারী খুব একলা হয়ে পড়েছে। তুমি থাকলে ওর একজন সঙ্গী হয়। বলতে বলতে মুখ টিপে হাসলেন। শেলীর দিকে ফিরে বললেন, ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বল তো মা। তোমার স্যারকে পৌঁছে দিয়ে আসুক। রাত হয়ে গেছে।

শেলী আমাকে গোট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে আসল। কিছু একটা বলা উচিত তাকে। কিন্তু কোন কথাই বলতে পারলাম না। গাড়িতে ওঠার সময় শেলী শান্ত স্বরে বললো, আপনাকে কিন্তু আসতেই হবে।

ঘরে ফিরে দেখি সফিক শুয়ে আছে। তার চোখ ঈষৎ রক্তাভ। বোধহয় আবার জর আসছে। সফিক ক্লান্ত স্বরে বলল, নিশানাথ চলে গেছে। বিদায় নিতে এসেছিল আমাদের কাছে।

কোথায় গেছে?

প্রথমে বারহাট্টা। সেখান থেকে যাবেন মেঘালয়ে। তাঁর কোন জ্ঞাতি খুঁড়ো থাকেন তার কাছে যাচ্ছে। ঐখানেই থাকবে।

আমার অবাক হওয়ার ক্ষমতাই নষ্ট হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ কোনো কথাই বলতে পারলাম না। সফিক বললো, কী জন্যে থাকবে সে? তিন পুরুষের কুলধর্ম ছাড়তে পারে কেউ?

আর আসবে না ফিরে?

না।

সফিক হঠাৎ বিছানায় উঠে বসে উত্তেজিত স্বরে বলল, নিশানাথ না থাকুক তুই তো আছিস। দুজনে মিলে দেখা না কী কাণ্ড করি। আমি চুপ করে রইলাম। সফিক শুয়ে পড়ল। গায়ে হাত দিয়ে দেখি বেশ জ্বর। সফিক আচ্ছন্নের মত বলল, জ্যোতির্ষিণব কিন্তু সত্যি ভাল হাত দেখে। আজ আমি অবাক হয়েছি –খুব অবাক হয়েছি তার ক্ষমতা দেখে।

আমি কৌতূহলী হয়ে বললাম, কী বলেছে জ্যোতির্ষিণব?

সফিক সে কথার জবাব দিল না। আমি অবাক হয়ে দেখি তার চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে। অশ্রু গোপন করবার জন্যে সে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মৃদু স্বরে বলল, শুধু জ্যোতির্ষিণব কেন তুই নিজেও যদি আমাকে ছেড়ে চলে যাস আমার তাতে কিছুই যাবে আসবে না। আমি ঠিক উঠে দাঁড়াব।

সেই রাত্রে একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম। যেন আদিগন্ত বিস্তৃত একটি সবুজ মাঠ। মাঠের ঠিক মাঝখানে সফিক দাঁড়িয়ে আছে একা একা। তার গায়ে মুকুট নাটকের মধ্যম

রাজকুমারের পোশাক। আকাশ ভরা জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্না ভেজা সেই রাতে সবুজ মাঠের মাঝখান থেকে সফিক যেন হঠাৎ ভয় পেয়ে ছুটতে শুরু করল।

ঘুম ভেঙে গেল আমার। বাইরে এসে দেখি ফকফকা জ্যোৎস্না হয়েছে। বারান্দার মেঝেতে অপূর্ব সব নকশা। পায়ে পায়ে এগিয়ে উঁকি দিলাম। সফিকের ঘরে।

সফিক অন্ধকারে বসে চা খাচ্ছে একা একা। আমাকে দেখে সে হাসি মুখে ডাকল, চা খাবি রঞ্জু? আয় না, জ্বরটা সেরে গেছে। আমার বেশ লাগছে এখন।

অকারণেই আমার চোখে জল আসল।